কোর্ট-কাচারি

কোর্ট-কাচারি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আনন্দধারা প্রকাশন

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

করকমলেষু—

কোর্ট-কাচারি ॥ আদালতের সাহিত্য ॥ তদবির ॥ আপোস ॥
দুই উকিল ॥ প্রমোশন ॥ পরিসীমা ॥ শুম্ভ-নিশুম্ভ ॥ শাসন ॥
জ্যাম ॥ দু' মিনিট ॥ পোস্টার ॥ কালো কোট ॥
সারপ্রাইজ ভিজিট ॥ কাঁটালের মাছি ॥

কোর্ট-কাচারি

পূর্ণিমার তুল্য রাত নেই তেমনি বটের তুল্য বৃক্ষ নেই। আর, হাটের যেমন আটচালা, কোর্টের তেমনি বটতলা।

এই বটতলায় সাক্ষীরা বসে, মক্কেলরা ঘোরাফেরা করে, আর ওইখানেই দালালদের দা-এর কোপ মেরে লাল করার হাড়িকাঠ। এত চেঁচামেচি যে গাছের পাখি গাছ-ছাড়া।

সেই বটতলায় আমি কী করে এলাম?

কিন্তু সেখানে যাবাব আগে?

আমার প্রথম গল্প "দুইবার রাজা" প্রবাসীতে বেরুল, আর প্রথম উপন্যাস "বেদে" বেরুল কল্লোলেব পৃষ্ঠায়। সেই কি আমার লেখক হওয়া? তা যদি হয় তাহলে বলতে পারি, লেখক হবার আগে ছাত্র ছিলাম। এম-এ ইংরেজীর ছাত্র আর আইনের। এম-এ ক্লাশ সেরে সন্ধ্যেয় ল ক্লাশ করতাম। তারপর আড্ডা দিতে যেতাম পটুয়াটোলা লেনে, কল্লোল-অফিসে, দীনেশরঞ্জন দাশের বাসার একতলার ছোট্ট একরত্তি ঘরে। একটা দুর্বাব-উজ্জ্বল সুখহাস্যমুখর প্রতপ্ত প্রাণের মজলিসে। এম-এ ক্লাশ আর ল-ক্লাশের মধ্যে সময়ের যে ফাঁক ছিল তারও মধ্যে হাজির হতাম সেই যৌবনের রাজসূয়ে। ল-ক্লাশ শেষ হয়ে মুটকোর্ট শেষ হয়ে যেত, উঠতাম না আড্ডা ছেড়ে। জানি বন্ধুরা কেউ প্রক্সি দিয়েছে। না দিলেই বা কী। স্ফূর্তির রাজা নজরুল ইসলাম এসেছে, গান ধরেছে দীপ্তস্বরে। সেই আনন্দসত্র থেকে উঠে যায় কার সাধ্য? বাড়ির ভিতর থেকে আটার রুটি আর তরকারি আসত, খেতাম তাই ভাগাভাগি করে। কোনোদিন অদৃষ্টদোষে সেটা যদি ফসকে যেত, তাহলে—প্রসিদ্ধ মিষ্টির দোকান ছেড়ে দিয়ে এসেছি—চলে যেতাম আরেক খাবারের

দোকানে। দু আনায় ভূরিভোজ হত। চার পয়সায় চারখানা ফুলকো লুচি, ডাল ফ্রি, এক পয়সায় আলুর দমের বড় হলে দুটো, নয় তো ছোট হলে চারটে আলু, এক পয়সার চাটনি আর দু পয়সার হাফকাপ চা। আর এই দু আনা বাঁচানো ট্রামভাড়া থেকে—ট্রামের রাস্তা পায়ে হেঁটে। পাশে একজন কল্লোলের বন্ধু পেলে সমস্ত দুনিয়াই বুঝি তখন হেঁটে জিতে যেতে পারি। না নদীর কূল, না বৃক্ষের মূল, তখন শুধু পথ চলা।

তাই বলা যায় লেখক হবার আগে ছাত্র ছিলাম, মুক্তবন্ধ আড্ডাবাজ ছিলাম।

না কি বই ছাপা হয়ে বেরুবার পরই লোককে লেখক বলে? তা যদি হয় তবে আমার প্রথম উপন্যাস "বেদে" ও প্রথম কবিতার বই "অমাবস্যা" বেরুবার আগে আমি মাসিক পত্রিকার সবএডিটর ছিলাম। মাসিক পত্রিকার নাম "বিচিত্রা" আর তার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। আর, আসলে আমি প্রুফ-রিডারি করি, নাম নিয়েছি সবএডিটর। আসলে আরশুলা, নাম নিয়েছে পাখি। আসলে ভেরি ইনসিগনিফিক্যাণ্ট পার্সন, নাম নিয়েছে ভি-আই-পি। আপনার লেখাটি মনোনীত হয়েছে, যথাশীঘ্র সম্ভব ছাপা হবে, এইটি পোস্টকার্ডে লিখে পাঠানো কলমের মুখে এক নতুন রোমাঞ্চ। তাছাড়া পঞ্চাশ টাকা মাইনে—সে প্রায় এক সাম্রাজ্যের সমান। দু জোড়া ধুতি, দুটো পাঞ্জাবি, একজোড়া জুতো—সে প্রায় এক আকাশময় বাজি পোড়ানো। সর্বোপরি, রাগ নেই দ্বেষ নেই ভয় নেই বিবাদ নেই, সে এক প্রীতির নিরন্ত নির্ঝর উপেনবাবু—তাঁর নিরন্তর সান্নিধ্য, যা স্নেহ দয়া আর সহানুভূতির সমাহার। অতি আধুনিক বলে সে যুগে চিহ্নিত ছিলাম অনেকে, কিন্তু উপেনবাবু তাঁর অভিজাত পত্রিকায় সকলকে অকুণ্ঠ অভিবাদন করলেন, কৃপণতার ধার দিয়েও গেলেন না। নিন্দন আর নন্দন দুই-ই বুঝি স্রষ্টার পরিতোষ।

তাহলে বলা যায় লেখক হবার আগে মাসিক-পত্রিকার সব-এডিটর ছিলাম।

দু একখানা বই ছাপা হলেই লেখক বলা যাবে কিনা সন্দেহ থাকতে পারে। যদি এক আসনে লেগে থেকে এক নাগাড়ে অনেকগুলি বই লেখাই লেখকের লক্ষণ হয়, তবে পর পর কতগুলি উপন্যাস, প্রথম প্রেম, জননী জন্মভূমিশ্চ, ইন্দ্রাণী, অনন্যা, প্রাচীর ও প্রান্তর ইত্যাদি লিখে লেখক বনবার আগে আমি উকিল ছিলাম।

ল পাশ করে ওকালতির সনদ নিলাম। এক ফৌজদারি উকিলের সঙ্গে যুক্ত হলাম জুনিয়র হিসেবে। তিনি উপদেশ দিলেন, যদি সকসেস চাও, আইনকে জানো নয়, হাকিমকে জানো। তোমার আইন নিয়ে কোন কথা, তোমার হচ্ছে শুধু অনুকূল রায়। দেবতা বুঝে ভজন করো। যদি বোঝো শিব, একটু গঙ্গাজল আর গালবাদ্যেই হয়ে যাবে, কিন্তু যদি বোঝো শনি, আওড়াও আস্ত পাঁচালি, ছাড়ো অশনিগর্জন। বুঝলে না, যেমন হাঁড়ি তেমনি সরা, যেমন নদী তেমনি চড়া।

কত তীর্থ ঘুরেছি, এ এক অদ্ভুত তীর্থ—বটতলা। সম্ভ্রান্ত করে বললে, কোর্ট-কাচারি।

এখানে মহাদেবেরও ব্যাধি হয়, যুধিষ্ঠির দূরের কথা, স্বয়ং ব্রহ্মাকেও হতে হবে মিথ্যেবাদী। নির্জলা সত্যকেও এখানে ধরতে হয় ভেজালের চেহারা। এক পক্ষের সাক্ষীরা যদি সমবেত হয়ে বলে হিমালয় ভারতের দক্ষিণে আর অপর পক্ষ যদি তা প্রতিবাদ না করে, তবে কোর্টকে তাই সাব্যস্ত করতে হবে। যেমন ভক্তির সত্য আছে, সাহিত্যের সত্য আছে, তেমনি আছে আদালতের সত্য।

আর মেঘের শোভা যেমন সৌদামিনী তেমনি আদালতের শোভা উকিল-মোক্তার। সর্বত্র কালোর ছড়াছড়ি। যেমন বৈষ্ণব চিনি কপনিতে, মোল্লা চিনি দাড়িতে, তেমনি উকিল চিনি আলপাকায়।

ব্যাটসম্যানের যেমন শাদা প্যাড শাদা গ্লাভ, উকিলের তেমনি কালো কোট, কালো গাউন।

আর যা উকিল তাই হাকিম। পথাসন থেকে রথাসন।

একটি টাউট এসে জুটল। ঘাপটি মেরে জাল ফেলবার ফিকিরে ঘুরছে। বললাম, বার-লাইব্রেরিতে মেম্বর হবার মত রেস্ত নেই। তাই রাসবিহারী তো হতে পারব না, ঘাসবিহারী হয়েই বিচরণ করি। দালাল বললে, তা কেন, তক্তপোশ আর মাত্বর কিনে আন্থন, সেরেস্তা বানিয়ে দিচ্ছি। শ্মশানে যেমন নদী, আদালতে তেমনি বটতলা। তক্তপোশে-মাত্বরে সেরেস্তা হল গাছের নিচে। দাল্যাল বললে, কথা বেচে খাবেন, তাই সাজপোশাকটা দোরস্ত রাখবেন। টাই বেঁধেছেন না গলায় দড়ি দিয়েছেন। শুন্থন, লেপলে-পুঁছলে বাড়ি আর সাজলে-গুজলে নারী। বসিয়ে রাখল তক্তপোশে। কিন্তু, কোথায় মক্কেল, কোথায় তার আক্কেল-সেলামি? পেটে ভাত নেই, বসে-বসে কত আর গোঁফে তা দেব? দালালের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে যাই, কোর্টে-কোর্টে ঘুরি আর শুনি কাকে বলে জেরা, কাকে বলে সওয়াল-জবাব। কাকে বলে মুখেন মারিতং জগৎ। আমার সিনিয়র বললেন, সব সময়েই তুবড়ি ছোটাতে হবে এমন কথা নেই। কথার নামও মধুবাণী যদি কথা কইতে জানি। মুখকে ক্ষুরের ধার করা নয়, হৃদয়ে ক্ষুর থাক, মুখে মধু।

কুড়িয়ে-বাড়িয়ে প্রথম মাসে তেরো টাকা রোজগার করলাম। মাস কাবার হলে টাউট এসে বললে, মাইনে দিন। আমি বললাম, সে কি, মাইনে কিসের? মক্কেল আনো কমিশন নাও। টাউট বললে, সে তো মামুলি কথা। তার জন্যে আপনার সঙ্গ ধরব কেন? মাইনে চাই। আমি বললাম, ঘরে ভাত নেই দোরে চাঁদোয়া। নিজের রোজগার নেই, আলালের ঘরের তুলাল, দালালের মাইনে। আচ্ছা দেখে নেব। শাসিয়ে গেল দালাল। পরদিন বটতলায়

গিয়ে দেখি তক্তপোশও নেই মাদুরও নেই। সব কিছু বেপাত্তা। আর দালাল? সেও হাওয়া হয়ে গিয়েছে।

বাড়িতে ফিরে এসে লেখা নিয়ে বসলাম। মাকে বললাম, মা, আর যাব না মথুরায়। মা বললেন, সে কি? এত যে সব জামা-কাপড় করলি, গাউন বানালি, তাব কী হবে? বললাম, মিউজিয়মে পাঠিয়ে দাও। ভক্তি নেই তো কপালে চন্দন। মা বললেন, তাতে কী? লেগে থাকলেই মেগে খায় না। আমি বললাম, গলা নেই তো গাইব কী! · সেবেস্তা নেই তো কিসের ওকালতি? গলা নেই গায়, গায়, বউ নেই শ্বশুববাড়ি যায়। তেমন শ্বশুববাড়িতে যাব না।

গেলাম না।

তা হলে বলতে পাবি লেখক হবাব আগে উকিল ছিলাম।

কিন্তু আদালত ছাড়ি এমন সাধ্য কী! আদালতই তো সাহিত্যেব অন্যতম পাদপীঠ। বিস্তীর্ণ মানুষ-মেলা। যেখানে ধন মিথ্যে জন মিথ্যে বিচার মিথ্যে। যেখানে ভূত-পঞ্চ শতরঞ্চ সব ধোঁকাব টাটি।

আবার তাই মিথ্যেকে উপব থেকে দেখতে আদালতেই ফিরে এলাম।

যখন আবাব ফিবে যাব, নেমে দাঁড়াব, সেই সাহিত্যেই প্রত্যাবর্তন হবে। সর্বত্র সাহিত্য—উপবে, নিচে, দক্ষিণে উত্তবে—স এবেদং সর্বমিতি।

আদালতে সাহিত্য

'তারপরে, আদালত, বিচার করে দেখবেন এ কখনো বিশ্বাসের যোগ্য ?'

নিম্নতম আদালতে সওয়াল হচ্ছে। উকিল যুগল নস্কর।

'কোন সাক্ষীর কথা বলছেন ?' জিজ্ঞেস করল হাকিম।

'পি-ডবলিউ টু, আদালত।' যুগল বললে।

'রামহরি বিশ্বাসের কথা বলছেন ?' আবার হাকিমের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, আদালত।'

'যে দলিলের ইসাদি ?'

'ঠিক, আদালত।'

এখানে 'আদালত' মানে সম্বোধনে আদালত। হাকিমকে সম্বোধন করতে হলে আগে 'হুজুর' বলত, এখন 'আদালত' বলে। হুজুর বলাটা অসম্মানের। যাকে বলে তার নয়, যে বলে তার। কোদালকে কোদাল বলাই সমীচীন। কোর্ট ইজ কোর্ট।

স্যার কথাটা তো বাংলায় চলে গিয়েছে। স্যার বললেই তো চলে। না, কখনো-কখনো স্যার বলাটাও হীনম্মন্য। তাছাড়া মফস্বলী উচ্চারণে স্যার কখন ষাঁড় শোনাবে, তখন কেলেঙ্কারি।

সেই যেমন হয়েছিল সেবার গরু নিয়ে।

মাঠ থেকে ক্রোক করে একটা গরু ধরে এনেছে নাজির। কোর্টের বারান্দায় খুব গোলমাল।

উকিলকে জিজ্ঞেস করল মুন্সেফ, 'গোলমাল কিসের ?'

উকিল বললে, 'হুজুর একটা গরু।"

হাকিম বললে, 'হুজুরের পর কমা দিয়েছেন তো ? না, কথাটা টানা রেখেছেন ?'

'মফস্বলী প্রেস তো, ভাঙা টাইপে ভর্তি। মাঝে মাঝে কমা কম পড়ে।'

গম্ভীর হল হাকিম।

নিম্নতর আদালতে ব্যারিস্টার খোকন কুণ্ডু এসেছে আর্গুমেন্ট করতে।

সাবজজ ভগীরথ ভদ্র ভালোমানুষের মত মুখ করে আছে।

সাবজজ মানে 'সর্বজজ'—অফ আনলিমিটেড জুরিসডিকশান।

কথায়-কথায় মিলর্ড বলছে খোকন।

ভাবখানা, ফালাও প্র্যাকটিস, তাই মিলর্ডটা মুখের লব্জ। কিংবা ভগীরথ ভাবছে, সূক্ষ্ম আমড়াগাছি। পিয়ার নই আর্ল নই ডিউক নই বিশপ নই, আমি আবাব লর্ড কী! লোকে বলতেই বলে, আমি হচ্ছি টেনথ সাবজজ।

বলাই বড়ালের বউয়ের তেজ কী। বলে, 'আমার উনি হচ্ছেন ফার্স্ট মুন্সেফ, আর হিতেন বর্ধন বুড়ো, সে কিনা থার্ড।'

হিতেনেব বউ বিদ্যুৎবরণী। সে অনুকম্পাব হাসি হাসল, 'থার্ড মানে কি গুণানুসারে তৃতীয়? থার্ড মুন্সেফ মানে তিন নম্বর কোর্টের মুন্সেফ। এক, দুই, তিন, চার—কোর্টের নম্বর দেওয়া থাকে, এলেকা অনুসাবে নম্বব। যে এক নম্বর কোর্টের মুন্সেফ তাকে বলে ফার্স্ট মুন্সেফ, আব যে দুই নম্বর কোর্টে সে সেকেণ্ড, যে তিন নম্বর কোর্টে সে থার্ড—'

'তাই যদি হবে তবে সিনেমায় সেদিন দেখলাম না, থার্ড মুন্সেফ প্রমোশন পেয়ে ফার্স্ট মুন্সেফ হল?'

'মুণ্ডু হল! পাগলে কী না বলে আর সিনেমায় কী না হয়! জোয়ান স্বামীর হাত ফসকে ছুঁড়ি বউ ছুট দেয়, স্বামী হাবার মত দাঁড়িয়ে থাকে আর বউ জলেও ডোবে না আগুনেও পোড়ে না, ধপাস করে মাটিতে পড়ে ঘাড় নাড়তে-নাড়তে মারা যায়।'

আপনি বললেই হবে?'

'আমি বলব কেন? তোমার কর্তাই বলবে। বলবে নম্বরে থার্ড হয়েও আমার স্বামীর বেশি মাইনে বেশি পাওয়ার। তার মানে তৃতীয় কোর্টের লোকই সিনিয়র।'

তারই জন্যে ভগীরথ ভদ্র লোকচক্ষে টেনথ সাবজজ। তার মানে, অধমাধম।

'এ হাকিম কথা কয় না যে।' ব্যারিস্টার বিপদে পড়ল।

'হ্যাঁ, এ "স্তব্ধ হাকিম"।'

অনেক দেখে-ঠেকে শিখেছে। শতং বদ মা লিখ্—এই ছিল ঋষিবাক্য। কিন্তু ভগীরথের মন্ত্র হচ্ছে, শতং লিখ মা বদ। কলম থাকতে রসনা কেন? রসনাই সবচেয়ে বড় শত্রু। বলতে গেলেই ঠোকাঠুকি। সীমান্ত নিয়ে কলহ। আর সভা মধ্যে স্তব্ধতাই বড় শোভা। বোবাই নিঃশত্রু।

' "মুখর হাকিম" কেউ নেই?'

'আছে না? টগবগ সিং আছে, বক্তিয়ার খাঁ আছে। আপনাকে বলতে দেবে না, সব আর্গুমেন্ট নিজে করবে। আট পাতার রায়, লিখবে আশি পাতায়। টাইপিস্ট-কপিইস্টের অক্ষর গুণে রোজগার, তাদেরই পোয়া বারো।'

'তেমন একটা কোর্টে ট্র্যানসফার করে নিলেই পারতেন। কথা-কাটাকাটিতে বোঝা যেত মন কী ভাবছে, কোন দিকে ঝুঁকছে। এ যে মশাই নিরেট। কাটলেও রক্ত নেই কুটলেও মাংস নেই।'

'ও সাইডের সঙ্গে "তদবিরে" পারা গেল না।'

আর্গুমেন্টের সময় হাকিম রতিলাল গুপ্ত বিরক্ত-বিরক্ত মুখ করে থাকে। ভাবখানা এই, কেন লম্বা করছ, সবই তো বুঝে নিয়েছি এক পলকে।

'এ পয়েন্টটা তো ক্লিয়ার, এ নিয়ে ডাইলেট করছেন কেন?' আবার বাধা দিল রতিলাল।

অভিজ্ঞ উকিল শ্যামলাল সর্বজ্ঞ তা মানবে কেন? সে তার

বক্তব্যকে ছাঁটতে-কাটতে রাজি নয়। বললে, 'আমাদের হাকিম শুধু সামনে নয়, পিছনেও। সামনে আক্কেল, পিছনে মক্কেল, সেলামি উভয় স্থানে। আপনি বুঝ মানলেন, কিন্তু পিছন যদি বুঝল চেঁচালাম না, টেবল চাপড়ালাম না, বই-টই দেখালাম না, তা হলেই সে ভেসে গেল! তা ছাড়া আপনাদের কি বিশ্বাস করা যায়?'

'তার মানে?'

'মানে তো শাস্ত্রেই বলেছে।'

'কী বলেছে?'

'স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।'

'স্ত্রী আর রাজকুল এক হল?'

'বিশ্বাস নৈব কর্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ। তাছাড়া মাঝে মাঝে আপনারা "সখীর ভাব" করে থাকেন। সে ভাবে ভবী আর ভুলছে না।'

' "সখীর ভাব"? সে আবার কী?'

'এক জমিদার পূজোর বাজারের জন্যে ফর্দ তৈরি করেছে। নায়েবকে বলেছে, যাও, সদবে গিয়ে ফর্দ মোতাবেক জিনিস নিয়ে এস। যে আজ্ঞে। নায়েব এসেছে সদরে। লম্বা ফর্দ, প্রথম আইটেমেই "সখীর ভাব।" সে আবার কী বস্তু? মহা ফাঁপরে পড়ল নায়েব।

"সখীর ভাব" কোথায় মিলবে? আর সব কিছু কেনা হল, ফলশস্য, বস্ত্রবাসন, কিন্তু "সখীর ভাবের" দেখা নেই। সন্ধ্যে হলে, অনেক বুদ্ধি খরচ করে, সখীদের পাড়ায় গিয়ে ঢুকল। হার্মোনিয়ম-বাজানো গান শুনল, দেখল নানা হাসি-খুশির রং-ঢং, কিন্তু ভাব ভাবই, শত পয়সা ঢেলেও কেনা গেল না।

গরুর গাড়ি বোঝাই করে নায়েব ফিরল মফস্বলে। জমিদারকে প্রণাম করে বললে, 'সব এনেছি, কিন্তু একটা জিনিস শুধু পেলাম না।'

'কোনটা ?'

'সখীর ভাবটা।'

' "সখীর ভাব" মানে ?'

'ফর্দের যেটা এক নম্বর।'

'ওটা "সখীর ভাব" ?' তেড়ে এল জমিদার: 'ওই হল পুজোর প্রধান উপচার। ওটা হচ্ছে সশীষ ডাব।'

সশীষ ডাব পড়তে নায়েব "সখীর ভাব" পড়েছে। আপনার হাসিমুখ দেখে মনে হচ্ছে "সখীর ভাব"—আমার দিকেই বুঝি রায় দেবেন। কিন্তু রায় বেরুলে দেখব, সশীষ ডাব হয়ে দেখা দিয়েছেন! তাই আর ভুল করতে রাজি নই। পুরোপুরি বলে যাই।

'কিন্তু দেখুন, এই গোয়েথ্ কে ?' আপিল শুনছে, জিজ্ঞেস করলে বিপিন ধর। 'পি-ডবলিউ না ডি-ডবলিউ ?'

'এমন নামের সাক্ষী কেউ জবানবন্দি দিয়েছে নাকি ?' জুনিয়রকে জিজ্ঞেস করল সিনিয়র।

'না, এই যে রায়ে লেখা, গোয়েথ বলছে—'

'স্যার, উনি সাক্ষী নন, উনি জর্মান কবি গ্যেটে।'

'গ্যেটে ? তা এ মামলার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী ?'

'সম্পর্ক নেই বা থাক। নিম্ন আদালত পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন। এত যে উনি জানেন-শোনেন, পড়াশোনা করছেন তা দেখান কোথায় ? রাম-শ্যামের মামলায় রায় লেখার চান্স পেয়েছেন, ছেড়েছেন বিদ্যার তোপ। এই দেখুন শেক্সপিয়র মিলটনও আছে, হ্যাভলক এলিস ফ্রয়েডও বাদ নেই—'

'যেমন উদ্ধৃতি তেমনি উচ্চারণ।' অস্ফুটে বললে জুনিয়র।

'একটা "পাঁপরের" দরখাস্ত শুধু আছে।' বললে পেশকার।

'পাঁপর আছে, চাটনি নেই ?'

কী বুঝল কে জানে, হাসল পেশকার।

"পাঁপর" মানে পপার। অপারগের মামলা।

'দরখাস্তকারীর পেশা কী লিখেছেন ?' জিজ্ঞেস করল আদালত।

'পেশা "নাস্তি," স্যার।' উকিল বললে।

'লিখিনি নাস্তি ?'

'না, লিখেছেন, পেশা "পরান্নভোজী"! পপার মানে পরান্ন-ভোজী ?'

'হরেদরে ঐ একই কথা। যার কিছু নেই অথচ যাকে খেতে হবে—'

'না, ওসব হীন কথা চলবে না। কুলি এখন তাই "মজদুর" আর্দালি "সাথী" আর পপার "য়্যাসিস্টেড পার্সন," মানে "সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি"। কিংবা আরো সম্ভ্রান্ত করুন, "অপর্যাপ্তবিত্ত"।'

'দাঁত ভেঙে যাবে, স্যার।'

'কিন্তু "হাঁটানে ছেলে" তা দাঁত ভাঙা নয়।'

'হাঁটানে ছেলে ? ইউ মিন দি ওয়াকিং চাইল্ড ?' জজ পার্কিনসন ভুরু কুঁচকোলো।

'ফাদারলেস চাইল্ড স্যার, হ্যাভিং য়্যানাদার ফাদার।' উকিল মাথা চুলকোলো।

'হোয়াট ?' গর্জে উঠল সাহেব।

'বলো তুমিই বলো। সাহেবকে বুঝিয়ে দাও।' উকিল প্ররোচিত করল সাক্ষীকে।

'ইয়েস—' অভয় নয়নে পার্কিনসন তাকাল আতাউল্লার দিকে।

আতাউল্লা বললে, 'হুজুরের পরিবার যদি হুজুরের থেকে তালাক নিয়ে আমাকে নিকে করেন তবে হুজুরের যে-ছেলে মেমসাহেব আমার ঘরে নিয়ে আসবেন সেই হবে আমার হাঁটানে ছেলে।'

'হোয়াট ?' পার্কিনসন পেপারওয়েট তুলে নিল।

'এতে রাগবার কী ? উলটোটাও হতে পারে। আমার পরিবার যদি তেমনি আপনার হেপাজতে যায় আর আপনি যদি তাকে নিকে করেন, তাহলে আমার যে ছেলে-

'স্টপ হিম'।' সাহেব চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল।

মামলায় হেরে গেছে আতাউল্লা। 'ডিসমিসড উইথ কস্ট।'

উকিল সান্ত্বনা দিচ্ছেঃ 'মোকদ্দমা হাবিয়ে দিয়েছে বটে কিন্তু এই ছাখ হাকিম কী লিখেছে! ডিসমিসড উইথ কস্ট। মানে ডিসমিস করেছে বটে, কিন্তু ডিসমিস করতে হাকিমের কষ্ট হয়েছে। সুতরাং আপিলে নিশ্চয়ই ফল পাবি। দরগায় গিয়ে মানসিক কব, আর আমাকে—'

মানসিক হলে, বাচনিক হলে, "চাক্ষুষিক" হবে না কেন?

'তারপরে "চাক্ষুষিক" সাক্ষী যারা আছে—' ডিফেন্সেব উকিল জুরিকে য়্যাড্রেস করছে।

' "চাক্ষুষিক"? হোয়াট ডু ইউ মিন?' প্রাণজীবন জজ হুমকে উঠল।

' "চাক্ষুষিক" সাক্ষী মানে আই উইটনেস স্যাব।'

'দেখা-সাক্ষী বললেই হয়।'

'ও রকম বললে য়্যাড্রেসেব মান থাকে না।'

'তাহলে শোনা-সাক্ষী কী বলবেন?'

' "শ্রাবণিক" সাক্ষী।'

'ও সব ভুল চলবে না।' গম্ভীব হল প্রাণজীবন। 'শোনা-সাক্ষী তো আইনেই অচল, কিন্তু দেখা-সাক্ষীকে সম্ভ্রান্ত করতে হলে প্রত্যক্ষদর্শী বলুন, বলুন সাক্ষাৎদ্রষ্টা।'

সংস্কৃতে বিশারদ প্রাণজীবন। সবাইকে বলে বেড়ায়, হিন্দু আইন শেখবার জন্যেই যত্ন কবে সংস্কৃত পড়েছি।

লোকে ইংরিজি-বাংলায় বক্তৃতা দেয়, প্রাণজীবন দেয় সংস্কৃতে। কারু সাধ্যি নেই ভুল ধরে। হৃষ্টপুষ্ট দেখে বাংলা শব্দ বেছে নেয় আর তাক বুঝে অনুস্বার-বিসর্গ ঝাড়ে। ক্রিয়াপদে গোলমাল বুঝলেই ত-তব্য-অনীয় লাগায়। আর অতীত কাল বোঝাতে সরাসরি "স্ম" ধরে। প্রতিবসতি-স্ম।

"জজসাহেব একা-একা লাখ-লাখ টাকার বিচার করতে পারেন কিন্তু এ খুনের মামলার একক বিচারক হবার তাঁর সাধ্য নেই। এ মামলার বিচারক আপনারা। দায়িত্ব আপনাদের। যৌথ দায়িত্ব। দোষী কি নির্দোষ বলবেন এক সুরে। "নয়ে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাই লাজ।"

'নয়ে মিলে? না, না, দশে মিলে করি কাজ–

'জুরির সংখ্যা নয়, স্যার।' বললে ভজহরি সরখেল।

'বা, তার জন্যে নয় বলবেন? প্রচলিত কথা পালটাবেন? এখানে দশ মানে কি গুনে-গুনে দশ? গুনে-গুনে হয়, বেশ তো, আমাকেও যোগ করে দিন। দশ বলুন।'

'আপনি যে ওদের সঙ্গে একমত হবেন তার নিশ্চয়তা কী। তাই নয়ে মিলে করি কাজই ঠিক। হয়কে নয় বা নয়কে হয় যদি করতে হয় ওবাই করবে।'

প্রাণজীবন চুপ করে রইল।

'সরকারী গজল্লা শুনেছেন, এবার আমারটা শুনলেন, তারপর শুনবেন জজসাহেবের "জ্ঞানগর্ভময়" ভাষণ।'

'হোয়াট ডু ইউ মিন? "জ্ঞানগর্ভময়"? গর্ভ তো হয়েইছে তবে আবার তা "ময়" করছেন কেন?'

'কথাটাকে সম্ভ্রান্ত করছি।'

'তার জন্যে এক অঙ্গে সীমাবদ্ধ না রেখে সর্বঅঙ্গে বিস্তৃত করছেন? প্রস্তরময় ভূমি, নদীময় দেশ, দয়াময় হরি পর্যন্ত শুনেছি, কিন্তু—' থমথমে মুখে থামল প্রাণজীবন।

'জ্ঞানগর্ভতেই হয়, আমি আবার "ময়ট" প্রত্যয় করছি।' গোঁফে তা দিল ভজহরি। 'তার মানে ডবল করছি। আপনি একে জজসাহেব তায় সংস্কৃতে পণ্ডিত।'

অসম্ভব।

'মামলাটা কিসের? খুনের। "খুন" শব্দ শুনেই ভয় পাবেন

না, ভড়কাবেন না, পরে হয়তো দেখবেন, ঘণ্টা। শুনতে ভূত কিন্তু আসলে হয়তো ছায়া। একটা সংস্কৃত শ্লোক শুনুন—'

'আবার সংস্কৃত ?'

'উপায় নেই, স্যার। সংস্কৃতই দেবভাষা। আমাদের আদালতের কোনো দলিলই সিদ্ধ হয় না সংস্কৃত ছাড়া। কোনো লিখন-পঠনের কার্যই "চাগে না"।'

'এটা কী রকম ক্রিয়াপদ হল ? শুদ্ধ করে বলুন, লিখন-পঠনের কার্য আরব্ধ হয় না। কিন্তু কথাটা কী ?'

' "পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে।" "কার্যঞ্চাগ" ছাড়া কোনো দলিল হয় ? কবালা-কটকবালা হয় ?'

'বলুন আপনার সংস্কৃত।'

'শব্দমাত্রং অভেতব্যং ন জ্ঞাতঃ শব্দকারণং। শব্দহেতুং পবিজ্ঞায় করলা গৌরবগতা ॥'

'মানে কী ?'

'মানে রাজার বাড়ির কাছে এক বনে হঠাৎ শোনা গেল ঘণ্টা বাজছে, রাষ্ট্র হয়ে গেল রাজ্য আক্রমণ করতে রাক্ষস এসেছে। দেশময় আতঙ্ক—মানুষ জন্তু জানোয়ার তো বটেই বাড়িঘর গাছপাথর সব যাবে এবার রাক্ষসের পেটে। কারু সাহস নেই বনে গিয়ে তদারক করে। রাজধানীতে করলা নামে এক দাসী ছিল। সে একদিন বুক বেঁধে বনে ঢুকল। গিয়ে দেখল, রাক্ষস কোথায় ? একটা বানর মন্দিরের ঘণ্টা চুরি করে এনে গাছের ডালে বসে জলসা করছে। শব্দরহস্যভেদী করলার জয়জয়কার পড়ে গেল। তা বলছিলাম শুনছেন খুন, কিন্তু অরণ্য প্রবেশ করে দেখবেন ঘণ্টা। পুলিসই বসে বসে ঘণ্টা বাজাচ্ছে।'

'কিন্তু করলা কে ?'

'করলা ? করলা আমাদের সমস্ত তিক্ত জিজ্ঞাসার প্রতিমূর্তি।

আর, এটা বুঝি শোনেন নি ? শেখানো সাক্ষীদের কাণ্ড ?' ভজহরি দাড়িতে হাত বুলোল।

'আবার সংস্কৃত ?'

'এটা বাংলা স্যার, এটা কেত্তন।'

'কী রকম ?'

'সবাই সমস্বরে গাইছে খোল বাজিয়ে, "হরি হরি হরি বলে তারাবধূব নয়নে।" সব সাক্ষীর এক গৎ। সব শেয়ালের এক রা। কিন্তু আসল কথাটা কী জানেন ? আসল কথাটা হচ্ছে, হরি হরি হরি বলে ধারা বয় দুই নয়নে। ধারাবয় দুই নয়নেই "তারাবধূর নয়নে" হয়ে গেছে। এ মামলাও তাই। তার মানেই গণেশ ওলটাচ্ছে, সুতো লম্বা করছে পাক দিয়ে।'

'সে আবার কী ?'

'আসল কথাটা পার্বতীসুত লম্বোদর। পুলিস গাইছে, পাক দিয়ে সুতো লম্বা করো।'

ঘড়িব দিকে তাকাল প্রাণজীবন।

'আর কত লম্বা করব ?' বসল ভজহরি।

তদবির

সতীপতি চোখ তুলে তাকালেন। লোকটাকে চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।

'একবার একটা মামলা নিয়ে এসেছিলাম আপনার কাছে।' হীরালাল বললে হাতজোড় করে: 'আবার আরেকটা এনেছি।'

কাগজপত্রে এক পলক চোখ বুলিয়েই সতীপতি বললেন, 'এ মামলা আমার কাছে কেন? আমি তো উপরের কোর্ট।'

চোখ-মুখ অসহায় করল হীরালাল। বললে, 'আপনাকে ছাড়া আর কাউকে চিনি না।'

'এ মামলা হবে কোর্ট অফ ফার্স্ট ইনস্ট্যান্সে।'

সেটা আবার কী! হীরালাল হাঁ হয়ে রইল।

'মানে নিম্ন আদালতে।' সতীপতি হাসলেন: 'তারপর সেখানে হেস্তনেস্ত হবার পর আমার পালা।'

'এত টাকার দাবি, তবু নিচুতে যেতে হবে?' অপমানের মত লাগল বুঝি হীরালালের।

'আমার আপনার ইচ্ছেয় তো হবে না।' বললেন সতীপতি, 'আইন টেনে এলাকা ভাগ করে দিয়েছে। বিবাদীর সঙ্গে চুক্তি যেখানে, বিবাদী যেখানে নিয়ত বাস করে সেইখানকার নিম্নতম কোর্টে মামলা হবে।'

'তবে দয়া কোরে একজন নিচু উকিল ঠিক কোরে দিন।' কাতর চোখে তাকাল হীরালাল।

'নিচু মানে লোয়ার কোর্টের উকিল—'

'হ্যাঁ, তাই। কথাটা ছোট করে বলা আর কি।'

'সংক্ষেপ করে।' হাসলেন সতীপতি: 'যেমন ক্রিমিন্যাল

উকিল।' বলতে বলতেই ফোন তুললেন। কাকে কী বললেন গুনগুন করে। পরে লক্ষ করলেন হীরালালকে ঃ 'যান, বলে দিলাম। প্রভাংশুর কাছে যান।' ঠিকানা বলে দিলেন।

'প্রভাংশুবাবু লোক কেমন ?'

'লোক কেমন মানে ?' বিরক্ত হলেন সতীপতি।

'মানে, ভালো লোক ?'

'আপনার উকিল দরকার। আপনার প্রশ্ন হবে উকিল ভালো কিনা। ভালো লোক কিনা সে-প্রশ্ন উঠবে জজের বেলায়। তখন প্রশ্ন, ভালো জজ কি না নয়, ভালো লোক কি না। মানে মা-গোঁসাই কি না—'

কাগজপত্র কুড়িয়ে নিয়ে হীরালাল প্রভাংশুর চেম্বারে এল।

বললে, 'সতীপদবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ, টেলিফোন পেলাম।' প্রভাংশু গম্ভীরমুখে বললে, 'কিন্তু ওঁর নাম সতীপদ নয়, সতীপতি।'

'সেটা একই কথা।' একটু বুঝি হাসল হীরালাল ঃ 'পদ্-তে আর পতি-তে তফাত নেই।'

কাগজপত্র দেখতে বেশি সময় নিল না প্রভাংশু। গম্ভীরতর মুখে বললে, 'এ মামলা নিতে পারব না।'

'সে কী ?' হীরালাল প্রায় গাড়িচাপা পড়ল ঃ 'পারবেন না নিতে ?'

'না। এ মামলায় কিছু নেই। কিচ্ছু হবে না।'

'হোবে না ?'

'ফল হবে না। হেরে যাব।' কাগজপত্রে ফিতে বাঁধল প্রভাংশু।'

হীরালাল ফিরে এল সতীপতির কাছে।

বললে, 'অন্য উকিল ঠিক কোরে দিন। যার কাছে পাঠিয়েছিলেন তিনি বললেন, কিসসু হবে না।'

'বটে? আচ্ছা, কাগজ রেখে যান। আমি দেখছি। কাল আসবেন।' পরে হীরালাল চলে যেতেই টেলিফোনে প্রভাংশুকে ডাকলেন সতীপতি।

'মামলাটা নিলে না যে?'

'মামলাটা মিথ্যে।' ওপার থেকে বললে প্রভাংশু।

'মিথ্যে না সত্যি তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার কী দরকার?' সতীপতি ধমকে উঠলেন।

'মনে হচ্ছে চুক্তিটা ভুয়ো, দলিলটা জাল।'

'তুমি কি ওকালতি করতে বসেছ, না, বোকালতি?' সতীপতি ঝাঁজিয়ে উঠলেন।

'কিন্তু যাই বলুন,' প্রভাংশু গলাব স্বরটাকে বুঝি একটু তরল করল: 'এ মামলাতে কিচ্ছু হবে না।'

'হবে না আবাব কী!' সতীপতি প্রায় আকাশ থেকে পড়লেন: 'উকিলেব অভিধানে হবে না বলে কোনো কথা নেই। তোমার হবে, আমার হবে, আব মক্কেলেব যা হবাব তা হবে।'

'নতুন উকিল, গোড়াতেই যদি হেরে যাই—' প্রভাংশু ঘাড় চুলকোল।

'তুমি আগাগোড়াই হারবে।' বাগ করে রিসিভাব রেখে দিলেন সতীপতি।

অগত্যা প্রভাংশু মামলা নিল।

কিন্তু মনে তার সুখ নেই। কাজে-কর্মে সত্যেব স্বাচ্ছন্দ্য পাচ্ছে না।

'আপনি ঘাবড়াবেন না।' হীরালালই আশ্বাস দেয়। বলে, 'ঠিক মত তদবির করতে পারলে ঠিক জিতে যাব মামলা।'

তদবির! এ আবার কী! প্রভাংশু লাফিয়ে উঠল।

এতে লাফাবার কিছু নেই। দেবতাকে তুষ্ট করতে চাওয়াকে

কেউ অপরাধ বলে না। কিন্তু দেবতা কী রকম তার একটু খোঁজ নেওয়া দরকার। দেবতা কি আশুতোষ, না, শনিঠাকুর? যেমন দেবতা তেমনি নৈবেদ্য।

'কী বলতে চান আপনি?' চোখ-মুখ তীক্ষ্ণ করল প্রভাংশু।

চেয়ারটা একটু কাছে টানল হীরালাল। বললে, 'যে এখন মামলাটা ধরেছে সে হাকিমটা কেমন?'

'যেমন হাকিমের হওয়া উচিত, ভীষণ কড়া।' প্রভাংশু মুখিয়ে এল: 'কিন্তু আপনার হাকিম দিয়ে কী কাজ! বলি আপনার মামলাটি কেমন তাব খোঁজ নিন।'

'সব মামলাই তো গোলমাল।' হীরালাল আরো কাছে ঝুঁকল: 'রায় নিয়ে কথা। যিনি রায় দেবেন তিনি কিসে খুশি হবেন সেটুকু দেখতে দোষ কী।'

'আপনি হাকিমকে ঘুষ দিতে চান?'

'ছি ছি ছি।' নাক-কান মলে জিভ কাটল হীবালাল: 'ঘুষ বলছেন কেন? ঘুষ নয় খুশ। মানে যাতে দেওতা খুশি হন। এ আদালতে এমন কোনো উকিল নেই যে হাকিমের আত্মীয় কি প্রিয়পাত্র? জামাই কি শালা কি ভায়রাভাই? যাকে দেখলে মনটা ছুনছুন কবে —'

'আপনি খোঁজ নিন গে।'

'তা নিচ্ছি।' বিনয়ে গলে গেল হীরালাল: 'যদি তেমন কাউকে পাই, ওকালতনামায় শামিল কোরে নিই। আপনি তো আছেনই, অধিকন্তু—'

'তেমন কাউকে যদি প্রত্যক্ষ শামিল করে নেন,' প্রভাংশু বললে, 'হাকিম নিজের ফাইলে রাখবে না মামলা। অন্য কোর্টে চালান করে দেবে।'

'আহাহা, প্রত্যক্ষে রাখব কেন? সূক্ষ্মে রাখব।' একটু বুঝি সূক্ষ্ম করেই হাসল হীবালাল: 'আপনিই সব করবেন, সে মাঝে

মাঝে আঁপনার পাশ ঘেঁষে এসে বোসে যাবে, ইঙ্গিতে বোঝাবে যে সে আপনারই লোক—

'তেমন যদি পান তাকে দিয়েই করান।' সামনের টেবিলের থেকে হাত সরিয়ে নিল প্রভাংশু।

'আহাহা, চটেন কেন?' হীরালাল ভ্যাবাচাকা মুখ করল: 'তদবিরটা যত সক করা যায়। আচ্ছা আপনি অঘোর শিমলাইকে চেনেন?'

'সে কে?'

'ইস্কলে নাকি হাকিম সাহেবের হেডপণ্ডিত ছিলেন। তাঁকে নাকি হাকিম খুব মানে, রাস্তায় দেখা হলে গড় হয়ে প্রেণাম করে। সে পণ্ডিত মশাই যদি বলেন একটু আমার হয়ে—'

'ওসবেব মধ্যে আমি নেই মশাই।'

'আহাহা, আপনি থাকবেন কেন? আমি ওসব দেখছি।' হীরালাল কাশল: 'আচ্ছা, আপনি বোবীন্দ্রনাথ জানেন?'

'রবীন্দ্রনাথ!' প্রভাংশু থ হয়ে রইল।

'চারদিকে এখন তো রোবীন্দ্রজয়ন্তী চলেছে—'

'তাতে কী?'

'তাতে কিস্সু না। খোঁজ নিয়ে জেনেছি হাকিম খুব বোবীন্দ্রভক্ত।'

'খোঁজ নিয়ে জেনেছেন?'

'ঘোড়া ধরতে হলে খোঁজ নিতে হয় না?' বোকা-বোকা মুখ করল হীবালাল: 'তেমনি একটু ওয়াকিবহাল হওয়া। শুনেছি বাড়িতে বোবীন্দ্রজয়ন্তী করছেন।'

'রবীন্দ্রজয়ন্তী করলে রবীন্দ্রভক্ত হতে হবে? কিন্তু, কেন, আপনি বলতে চাচ্ছেন কী?' প্রভাংশু অস্থির হয়ে উঠল।

'বলতে চাচ্ছি আপনার আর্গুমেণ্টে যদি কিছু রোবীন্দ্রনাথ কোট করেন!'

'রবীন্দ্রনাথ কোট করব? সঙ্গে উইকলি নোটস না নিয়ে সঞ্চয়িতা

নিয়ে যাব ?' এক মুহূর্ত কী চিন্তা করল প্রভাংশু। বলল, 'আচ্ছা, করব। একটা মাত্রই তো কোট করা চলে।' তাই করব'খন।'

'সেটা কী ?'

'সেটা হিং টিং ছট। বলব এ মামলা বিশুদ্ধ হিং টিং ছটের মামলা। দু' পক্ষের দু' উকিল আর হাকিম এই তিন শক্তি, তিন স্বরূপ। বলব চেঁচিয়ে, ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট। সংক্ষেপে বলিতে গেলে হিং টিং ছট।'

'আপনি চোটছেন।' মৃদু হাসল হীরালাল: 'কিন্তু রুগীর যখন সঙিন অবস্থা তখন সে তো কেবল ডাক্তার-কোবরেজই দেখায় না, টোটকা-টাটকি করে—কী বলেন, করে কিনা—তাকতুক ঝাড়ফুঁক কিস্‌সুতেই আপত্তি করে না। এমনকি ফকিরফোকরারও পায়ে ধরে—'

'আপনি ধরুন গে। আমার মশাই স্ট্রেট ড্রাইভ।' চেয়ারে পিঠ ছেড়ে দিল প্রভাংশু: 'হয় আউট নয় বাউণ্ডারি।'

'কিন্তু মোশায়, লেগ-গ্লান্সও তো আছে।' হীরালাল তাকাল মিহি করে।

'দেখুন, সব অদৃষ্ট।' আপোসের স্বরে বললে প্রভাংশু, 'অদৃষ্টে যদি থাকে তো হবে।'

'সেটাই তো কথা।' উৎসাহিত হল হীরালাল: 'নইলে আমি আপনি হাকিম সব নিমিত্তমাত্র। তারই জন্যে তো ভোগ চড়াচ্ছি মা-কালীর মন্দিরে। নবগ্রহের আখড়ায়। মানত করছি এখানে-সেখানে। ঢিল বাঁধছি। চেরাগ জ্বালাচ্ছি। সবরকমই করে রাখা দরকার। যেমন অ্যাকসিডেন্টের ঠাকুর আছে তেমনি আছে মামলামোকদ্দমার ঠাকুর। গভর্নমেন্টকে কোর্ট-ফি দিতে হয়, ঠাকুরদেরও কিছু দিতে হয় ডাব-চিনি—'

'তাই দিন না যত খুশি। তাতে আর কী আপত্তি!'

আর্গুমেন্ট হয়ে গিয়েছে। সাত দিন পরে রায় বেরুবে।

হীরালাল বুঝেছে হালে পানি নেই। কিন্তু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

এসে বললে চুপিচুপি, 'দেখুন, স্ট্রেট ড্রাইভই ঠিক করলাম।'

প্রভাংশু হাঁ হয়ে রইল।

'দেখুন, আঁচলে জিনিস থাকতে কেন পাঁচিলে খোঁজ করি!' হীরালাল কপালের ঘাম মুছল: 'ভাবছি হাকিমের বাড়িতেই সিধে ডালি পাঠিয়ে দি একটা।'

'ডালি পাঠাবেন?' প্রভাংশু আঁতকে উঠল। বললে, 'সিধে জেল হয়ে যাবে আপনার।'

'নির্দোষ ডালি মোশাই, ফ্রুটস অ্যাণ্ড ফ্লাওয়ার্স। এতে আর আপত্তি কী!'

'সাংঘাতিক আপত্তি। খববদাব, ওসব করতে যাবেন না। মামলা ডিসমিস হয়ে যাবে।' প্রভাংশু টিপ্পনী কাটল: 'তা ছাড়া হাকিমের নামও পুণ্যব্রত।'

'তবে একটা উপায় তো কিছু করতে হয়। বেতদবিরে মামলা ভেসে যেতে দেব?' প্রায় কাঁদ-কাঁদ মুখ করল হীরালাল।

সন্ধ্যেব পর বাড়ি ফিরেছে পুণ্যব্রত। পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেল দোরগোড়ায় একটা ঝুড়ি।

'এ ঝুড়ি কে রেখে গেল?'

চাকর ছুটে এল। গিন্নি ছুটে এলেন। ছুটে এল ছেলেমেয়েব দল।

'কই, কেউ দেখিনি তো।'

আনারস তো দেখাই যাচ্ছে, তারপরে আম। আরো গভীরে দই, সন্দেশের বাক্স—ও কি, মুরগি নাকি?'

'চাপা দাও, চাপা দাও,' আর্তনাদ করে উঠল পুণ্য: 'বাইরে ফেলে দিয়ে এসো।'

বাইরে ফেললেই বা নিস্তার কোথায়? বাইরে ফেললে তো আরো জানাজানি! আরো কেলেঙ্কারি!

বাঘে ছুঁয়েছে কী আঠারো ঘা।

যখন হাত দিয়েছেন গিন্নি, আরো গভীরে যাবেন। শেষ পর্যন্ত বার করলেন একটা কার্ড। তাতে প্রেরকের নাম লেখা। প্রেরকের নাম জওলাপ্রসাদ।

কে জওলাপ্রসাদ?

পুণ্যব্রতর চট করে মনে পড়ল। আজই একটা মামলার রায় লিখছিল যার বিবাদী জওলাপ্রসাদ। হীরালাল বনাম জওলাপ্রসাদ। সেই জওলাপ্রসাদের এই কাণ্ড।

দাঁড়াও, দেখাচ্ছি। ডালি দেওয়া বার করছি।

রায়টা ডিসমিসের দিকে যাচ্ছিল। পৃষ্ঠাগুলি ছিঁড়ে ফেলল পুণ্যব্রত, পুড়িয়ে ফেলল। নতুন করে লিখল আবার রায়। ডিক্রি করে দিল।

খুশিতে ফুটতে ফুটতে ছুটতে ছুটতে হীরালাল ঢুকল প্রভাংশুর চেম্বারে।

'কেমন আপনাকে জিতিয়ে দিলাম দেখুন।' ফি-এর বাকি বলে মোটা করে দিল কিছু বকশিশ।

'আমাকে জিতিয়ে দিলেন?' অবাক মানল প্রভাংশু।

'তা ছাড়া আর কী! এর পরে তো আপিল আছে। সেখানে কী হয় কে জানে। কিন্তু আপনার তো শুধু এই কোর্টেই প্র্যাকটিস, আপনার জয়ই অক্ষয় হয়ে রইল।'

জওলাপ্রসাদ আপিল করেছে। হীরালালের হয়ে দাঁড়িয়েছেন সতীপতি।

ফোন এসেছে প্রভাংশুর। সতীপতি বলছেন ওপার থেকে, 'কী হে, হবে না বলছিলে না? আলবত হবে। তোমার হবে, আমার হবে, আর মক্কেলের যা হবার তাই হবে।'

আপোস

'ম্যাট্রিমনিয়্যাল কেসের ফাইলিং ক্রমেই বেড়ে চলেছে।' সেরেস্তাদার বললে।

জজ অরুণেন্দু বিজ্ঞের মত হাসল: 'নতুন ছুরি পেলে আঙুল কাটবেই শিশুরা।'

'মফস্বলের নম্বরও কম নয়।'

'উপরে লিখে দিন।'

কী লিখতে হবে জানে তা সেরেস্তাদার।

'পেণ্ডিং ফাইলের স্টেটমেন্টটা দিয়ে দেবেন।' জজসাহেব মনে করিয়ে দিল।

উপর থেকে প্রার্থনা নামঞ্জুর হয়ে এল। সরাসরি নামঞ্জুর। লিখল, বিয়ে-ঘটিত মামলার জন্য আলাদা কোর্টের দরকার নেই। ফিগারস ডু নট জ্যাস্টিফাই।

সেই মামুলি বুলি। মুখস্থ গৎ। যেমন-কে-তেমন থাকো। স্ট্যাটাস-কো বজায় রাখো।

যেন তেমনিই সব আছে। যেন দেশ স্বাধীন হয়নি! বিয়ে-বিচ্ছেদের আইন পাশ হয়নি ইতিমধ্যে!

'তার মানে সমস্ত মামলা তুমিই করো।' ক্লান্ত মুখে বিরক্তির রেখা ফোটাল অরুণেন্দু। বললে, 'বোঝা যখন বইছ, তখন শাকের আঁটিটাও তোমার সইবে। শাকের আঁটি যে কখনো-কখনো বোঝার বাবা হতে পারে এ কে দেখে?'

সেরেস্তাদার নীরবে হাসল।

অরুণেন্দু ডাকল পেস্কারকে। বললে, 'সপ্তাহে একটা দিন বিয়ের জন্যে রাখুন। বিয়ে মানে ইয়ে—মানে ম্যাট্রিমনিয়াল কেস। মানে বিয়েভাঙার মামলা।'

'তাই ভালো।' শার্টের গুটোনো হাত লম্বা করতে লাগল পেস্কার।

'আর ছুটোর বেশি কেস রাখবেন না।'

'ছুটোই যথেষ্ট।'

'এসব মামলা তাড়াতাড়ি শেষ হওয়া উচিত। অ্যাডিসন্যাল কোর্ট চাইলুম, কর্তারা হুট-আউট করে দিল। যদি লোক না দেয়, কোর্ট না দেয়, কী আর করতে পারি? শামুক যায় হেঁটে হেঁটে, মামলা চলবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।'

'তা আর কী করা!' শার্টের হাতায় বোতাম লাগাল পেস্কার।

টেবিলের ড্রয়ারটা খোলা রেখে এসেছে মনে পড়তেই পালাল তাড়াতাড়ি।

ফাইল তুলে নিল অরুণেন্দু।

সুষমা তরফদার তার স্বামী অনাদির থেকে বিবাহবিচ্ছেদ চাইছে। হেতু? হেতু অনাদি অসৎ। দেবেশ বিশ্বাস তার স্ত্রী দীপালির থেকে বিবাহবিচ্ছেদ চাইছে। হেতু? হেতু দীপালি বয়ে গিয়েছে।

কেলেঙ্কারি!

কত বিচিত্র মামলার কত সচিত্র কাহিনী।

কদর্যেও যে এত ঐশ্বর্য আছে, তা কে জানত।

বিবাহবিচ্ছেদের ডিক্রি দেবার আগে আইন বলছে বিবদমান পক্ষদের মধ্যে আপোস ঘটাতে কোর্টকে চেষ্টা করতে হবে।

'আমি কী চেষ্টা করব বলুন তো। ঘটকালি করব? বাড়ি-বাড়ি যাব?'

'তা কী করে হয়?' পেস্কার বললে, 'তার জন্যে কার-এলাউয়েন্স কই?'

'কিন্তু চেষ্টা তো আমাকে একটা করতেই হবে। এবং সেটা নথিতে থাকা চাই। কিছু একটা চেষ্টা করেছি এ প্রমাণিত না হলে বিচ্ছেদের ডিক্রি সিদ্ধই হবে না। তবে কি আমি ওদের বাড়িতে

নিমন্ত্রণ করে আনব ? ভোজ খাওয়াব ?' পেস্কারের দিকে তাকাল অরুণেন্দু ঃ 'তারও বা প্রভিশন কোথায় ? তার খরচই বা কে দেবে ?'

'আপনার সে-নেমন্তন্ন অগ্রাহ্য করলে স্বামী-স্ত্রীর কনটেম্পটও হবে না।'

'তবে ওদের কোর্টেই ডেকে পাঠাই। এখানে আমার এই খাসকামরাতেই বসাই মুখোমুখি। কথা বলে দেখি। মেলাবার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, অর্ডারসিটে সেই মর্মে অর্ডার লিখুন।'

'হ্যাঁ, শুধু একটা রেকর্ড রাখা।' পেস্কার সায় দিল।

'মিলবে তো কত !'

নোটিশ পেয়ে সুষমা-অনাদি এসেছে কোর্টে। দু পক্ষের উকিল নিয়ে ঢুকেছে জজের খাসকামরায়।

আপোসের চেষ্টায় এসেছে, কিন্তু দু দলই রণমুখো।

দু প্রান্তে দুই চেয়ারে বসেছে স্বামী-স্ত্রী। এ দেয়ালে-টাঙানো ছবি দেখছে, ও জানলার বাইরে গাছ দেখছে।

অরুণেন্দু সুষমাকে বললে, 'অনাদিবাবুর দিকে তাকান। একটু হাসুন।'

'ছোঃ !' ঝটকা মেরে ঘাড় বাঁকাল সুষমা। মুখ ফিরিয়ে কাঠ হয়ে রইল।

এবার অরুণেন্দু লক্ষ্য করল অনাদিকে ঃ 'সুষমাদেবীর সঙ্গে কথা কন। ডাকুন নাম ধরে।'

অনাদি হুঙ্কার করে উঠল ঃ 'যার-তার সঙ্গে আমি কথা কই না।'

দু পক্ষের উকিল হাসতে লাগল।

আপোসের চেষ্টায় অরুণেন্দু ছোটখাট একটা বক্তৃতা দিল ঃ 'দেখুন ঝগড়াটা যতই কেননা এখন বিস্তৃত হোক, আসলে ছোট একটা বিন্দুতে তার বাসা। ছোট একটা বীজাণু থেকে সমস্ত শরীরে রোগ। ঐ ছোট্ট সুইচ-পয়েন্টটা মেরামত করতে পারলেই আবার আলোয় আলো হয়ে উঠবে। আসল উপায় কী জানেন ? শুধু

একটুখানি মনোভাবের বদল। নিজের স্ত্রীকে পরস্ত্রী আর নিজের পুরুষকে পরপুরুষ ভাবা। সাধনের শুধু এইটুকুই কৌশল। এ সাধন আমাদের দেশে অচল নয়। সহজ সাধন। তেমনি সহজভাবে দেখুন একটু পরস্পরকে—'

উকিলরা যথারীতি হাসল, কিন্তু অনাদি-সুষমা যেমনি বসেছিল ঘাড় ফিরিয়ে, তেমনি রইল নির্বিকার।

আরো অনেক কিছু বলল অরুণেন্দু। ক্ষমার কথা, দয়াদাক্ষিণ্যের কথা, সমস্ত বিরোধই যে অসার, অস্থায়ী, প্রপঞ্চমাত্র, সেসব উচ্চ দর্শনের কথা।

সমস্ত বক্তৃতা নিরর্থক। একটাও রেখা পড়ল না প্রস্তরে।

এভাবে হবে না। এত লোকজন থাকলে হবে না। উকিল থাকলে হবে না। উকিল থাকলে কি মামলা আপোস হয়?

ওদের খালি-ঘর দিতে হবে। দিতে হবে নিরঞ্জন নৈকট্য।

নাজিরকে ডাকল অরুণেন্দু।

বললে, 'নিচে মালখানায় কোনো ছোট নিরিবিলি ঘর আছে?'

'আছে।'

'দুখানা চেয়ার বসবে?'

'তা বসবে। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'কিন্তু ঘরটা একটু অন্ধকার।'

'অন্ধকার মন্দ কী! স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ তো।' নথিতে চোখ রাখল অরুণেন্দু: 'যান, গোছগাছ করে রাখুন।'

লম্বা দিন ফেলল পেস্কার। মামলার পক্ষদের আবার আসতে হবে সেদিন। আবার চেষ্টা করে দেখতে হবে।

এ এক বিষম ঝামেলা দাঁড়াল দেখছি লড়াই করতে এসেও দেখছি শান্তি নেই।

কিন্তু যাব না, এ কখনো বলা চলে না। কোর্টের নির্দেশ অমান্য করলে জরিমানা, নয়তো সরল জেল হয়ে যাবে।

কিন্তু এই চেষ্টার ঘটাও বা কতদিন চলে তার ঠিক কী।

তার চেয়ে মিটিয়ে ফেলাই ভালো।

সুষমা ভাবল।

আদালত থেকে সেদিন যখন সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছিল সুষমা, কেমন সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে, এমন কথাও মনে হল অনাদির। কী হবে আর কাসুন্দি ঘেঁটে? যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে কঠিন বাহুতে তাকে প্রবল স্নেহে জড়িয়ে ধরতে পারে, মামলা এই মুহূর্তেই ফেঁসে যায়। এও ভাবল অনাদি।

বারোটার সময় ম্যাট্রিমনিয়্যাল কেসের ডাক পড়ল।

খাসকামরায় ইজি-চেয়ারে শুয়ে সিগারেট খাচ্ছিল অরুণেন্দু, হাজিরা হাতে নিয়ে পেস্কার এসে বললে, 'পক্ষরা এসেছে।'

'এসেছে?' উঠে বসল অরুণেন্দু: 'আর্দালিকে বলুন ওদেরকে নিচে মালখানার ঘরে ঢুকিয়ে দিতে।'

আর্দালি লাফিয়ে এল।

অরুণেন্দু জিজ্ঞেস করলে, 'নাজির যে ঘরটা ঠিক করেছে চেন?'

'চিনি, হুজুর।'

'সেই ঘরে ওদের দুজনকে ঢুকিয়ে দাও। আশেপাশে ভিড় যেন না জমে।' একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল অরুণেন্দু: 'আর বাইরে থেকে দরজা টেনে দাও। গার্ড থাকো। খানিকক্ষণ নিশ্চিন্তে থাক ওরা ভিতরে।'

'জী, হুজুর।' চোখেমুখে উৎসাহ নিয়ে নেমে গেল আর্দালি।

দেখি মেটে কিনা। পাথর গলে কিনা। ইজিচেয়ারে আবার গা ঢালল অরুণেন্দু।

চোখে তন্দ্রার একটু ঢুল লেগেছিল, হঠাৎ নিচে একটা হৈ-চৈ উঠল।

কী ব্যাপার ?

কতগুলি উকিল এল হন্তদন্ত হয়ে। পড়ি-মরি করে।

'কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে স্যার, কেলেঙ্কারি। মালখানার ঘরে অনাদির সঙ্গে তার স্ত্রীকে না ঢুকিয়ে অন্য মামলার বিবাদী দীপালি বিশ্বাসকে ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

'কী করে হল ?' জিজ্ঞেস করলে সেরেস্তাদার।

'শুক্রবার দিন ছুটো করে ম্যাট্রিমনিয়্যাল কেস থাকে। আজও তাই ছিল।' সাফাই গাইল পেস্কার : 'ছুটো কেসই একই ভাবে একই তারিখ ধরে-ধরে চলছিল ধাপে-ধাপে। দেবেশ-দীপালিরও আজ আপোসের চেষ্টায় কোর্টে আসার নির্দেশ ছিল। এসেও ছিল দুজনে। কোর্টের স্বামী-স্ত্রীরা তো একসঙ্গে থাকে না, এ এ-বাবান্দায় হাঁটে তো ও ও-বারান্দায়। তাই ঘরে একসঙ্গে ঢোকানো যায়নি। অনাদিকে আগে ঢুকিয়ে ওর বিপক্ষকে খুঁজতে গিয়ে আর্দালি অন্য মামলাব বিবাদিনীকে এনে সামিল করে দিয়েছে।'

'অত কথায় কাজ কী ?' বিপন্নেব স্থুরে চেঁচিয়ে উঠল অরুণেন্দু : 'বলি বেরিয়েছে ঘর থেকে ?'

'বেরিয়ে আসতে পেরেছে ?' কে আরেক জন ফোড়ন দিল।

'চলুন দেখি গে।' নিচে নামল সেরেস্তাদার।

সুষমা তরফদার এল খাসকামরায়। উকিল না দিয়ে নিজেই বলল হাকিমকে, 'স্যাব, আমাব স্বামীকে দেখুন। কী নীচ, কী জঘন্য !'

'আর দেখুন স্যার, আমার স্ত্রীর স্বভাবটা।' অন্য মামলার বাদী দেবেশ বিশ্বাস হুঙ্কার করে উঠল : 'জাবনা খেতে পরগোয়ালে ঢুকেছে।'

ছুই মামলারই শুনানির দিন ফেলে দিল অরুণেন্দু। অর্ডারসিটে লিখল, আপোসের প্রাণান্ত চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু আপোস সুদূরপরাহত।

দুই উকিল

'আরে, আপনি?' চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে এল প্রশান্ত: 'আপনি কবে এলেন? নিচু হয়ে প্রণাম করল আগন্তককে। একটু বা উচ্ছ্বসিত হয়েই করল।

মুগ্ধের মত তাকিয়ে দেখল ভদ্রলোকের হাতে একটা কাগজের বাণ্ডিল। গোলাপী ফিতে দিয়ে বাঁধা।

এ রকম রমণীয় দৃশ্য বুঝি আর হতে নেই। ঐ গোলাপী ফিতেটাই বুঝি আশার হাতছানি।

বেরালের যেমন শিকে উকিলের তেমনি ব্রিফ।

যা ভেবেছে তা না-ও হতে পারে। কখনো-কখনো গোলাপী ফিতে একটা বিশুদ্ধ ছলনা।

চারদিকে তাকিয়ে আগন্তুক বললেন, 'বাড়িটা তো ভালোই পেয়েছ।'

'ছোটর মধ্যে মন্দ নয়।'

'বাড়ির পজিশনটাও ভালো। ট্রাম রাস্তার কাছে। বেশি ঘুরতে হবে না মক্কেলদের।'

প্রশান্ত সামান্য হাসল।

'তা বই-টইও বেশ যোগাড় করে নিয়েছ দেখছি।'

'বই কোথায়? শুধু নজিরের স্তূপ।'

'আজকাল আইন তো বইয়ে নয়, নজিরে।' মাঝখানে টেবিল, মুখোমুখি বসলেন আগন্তুক। ঘনতর সুরে জিজ্ঞেস করলেন: 'হাইকোর্টে কেমন হচ্ছে?'

'ঠিক হচ্ছে না এখনো,' এবার প্রশান্ত সশব্দে হাসল: 'হব-হব হচ্ছে।'

'হ্যা, নিশ্চয়ই হবে।' ভদ্রলোক উৎসাহভরা উদার স্বরে বললেন, 'তুমি এত বড় একটা ব্রিলিয়্যাণ্ট স্কলার, তোমার বিদ্যেবুদ্ধি পাণ্ডিত্য বৃথা যাবে না।'

'এর আগে দু বছর যে মফস্বলে ছিলাম কিচ্ছু হয়নি।'

'তুমি মফস্বলের পক্ষে বেমানান,' ভদ্রলোক আরো উত্তপ্ত হলেন: 'তোমার ফিল্ড হচ্ছে হাইকোর্ট।'

'ঐ যে কানুনগো হিসেবে ফেইলিউর হবার পর তাকে সাবডিপটি করে দিল আর সাবডিপটি হিসেবে ফেইলিউর হবার পরই ডিপটি—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আগন্তুক বললেন, 'আজকাল হলে কানুনগো হিসেবে ফেইলিউর হবার পরই মিনিস্টার—'

'তেমনি মফস্বলে ফেইলিউর হবার পরে হাইকোর্ট।' আবার হাসল প্রশান্ত।

'যারা মফস্বল থেকে আসে তারা নাকি খুব চেঁচায়?'

'মামলা পেলে তো চেঁচাবে।'

'না, তুমি চেঁচিও না। আস্তে-সুস্থে ধীরে-ধীরে আর্গুমেণ্ট করবে। যে যত সম্ভ্রান্ত, শুনেছি, সে তত নিস্তেজ।'

'যদি এমন হয় আপনার কথা জজেরা শুনতে পাচ্ছে না, তাহলে বুঝতে হবে আপনি না-জানি কী অমূল্য বস্তু পেশ করলেন—'

'হ্যাঁ, আনহার্ড মেলডিই বেশি মধুর।' ভদ্রলোক বাণ্ডিলের ফিতে খুলতে লাগলেন।

বেরালের ভাগ্যে শিকে কি তবে ছিঁড়বে?

বড় আস্তে-সুস্থে ধীরে-ধীরে ফিতেটা খুলছেন ভদ্রলোক। ভঙ্গিটা বড় বেশি সম্ভ্রান্ত।

'একটা সেকেণ্ড আপিল—

'কী মামলা?' হাত বাড়িয়ে প্রশান্ত ব্রিফটা টেনে নিল।

'খাস দখলের। আমাদের গ্রামের শরৎ সমাদ্দারকে মনে আছে? তারই জমি।'

ব্রিফ ওলটাতে-ওলটাতে প্রশান্ত বললে, 'দু কোর্টেই হেরেছে ?'

'মুন্সেফের জাজমেণ্ট তো আগাগোড়া ভুল। আর সাবজজ অকালে বুড়ো হয়েছে, খাটতে চায় না। আপিল ওলটাতে হলেই বেশি লিখতে হয়, যেতে হয় এভিডেন্সের মধ্যে, রুলিং-এর মধ্যে, তাহলেই তো বেশি খাটনি। তাই নমো-নমো করে সারবার তালে থেকে নিচের রায়টা বহাল রেখেছে। আই হ্যাভ নো রিজন টু ডিস্টার্ব দি ফাইণ্ডিং—'

কতক্ষণ চুপ করে থেকে নথিটা পড়ল প্রশান্ত। জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি নিচে ছিলেন ?'

'দু কোর্টেই ছিলাম।'

উপর-উপর দেখেই একটা শর্ট-পয়েণ্ট আবিষ্কার করল প্রশান্ত। বললে, 'এ পয়েণ্টটা আর্গু করেছিলেন ?'

'করেছি বৈ কি। কিন্তু তোমাকে বলব কী, মুন্সেফটা গোঁয়ার আর সাবজজটা তালকানা।'

আরো কতক্ষণ নীরবে নথি পড়ল প্রশান্ত।

ভদ্রলোক বোধ হয় প্রশান্তের কপালে রাজটীকা দেখলেন। বললেন, 'আমি তখনই বলেছি এত কুইক গ্র্যাস্প সচরাচর দেখা যায় না। শরৎ সমাদ্দারের ইচ্ছে ছিল একজন সিনিয়র দেয়, আমি বললাম, না, প্রশান্তই যথেষ্ট।'

'শরৎবাবু কোথায় ?' নথির থেকে ক্ষণিক চোখ তুলল প্রশান্ত।

'কালীঘাটে পুজো দিতে গিয়েছে।' অনুকম্পা মিশিয়ে হাসলেন ভদ্রলোক।

'আপিল ফাইল করবার আগেই কালীঘাট ?'

'হ্যাঁ, আগেই আদ্যাশক্তি। কালীই হাইকোর্টেশ্বরী।' ভদ্রলোক দার্শনিকের মত ঔদাস্য আনলেন: 'কিছুই বলা যায় না। কখনো পারে এসে তরী ডোবে, কখনো বা ডাঙাতেই নৌকো চলে।'

'তা তো ঠিকই।' বিনয় মিশিয়ে বললে প্রশান্ত।

'নানা মুনির নানা মত। ক্ষণে-ক্ষণে নানা মত। সমস্ত অনিশ্চয়। তাই শুধু প্রার্থনা, মা, তোমার আইন তোমাতে থাক, তুমি শুধু রায়টুকু আমার করে দাও—'

'তা হলে—' প্রশান্ত নির্ভুল স্বরে সেই বজ্রগর্ভ ইঙ্গিত করল: 'তা হলে—'

অলক্ষ্যে জামার পকেটে হাত রাখলেন ভদ্রলোক। বললেন, 'তা হলে তুমি একাই পারবে মনে করছ?'

'না-পারার তো কারণ দেখি না। বেশ তো, আপিলটা আগে য়্যাডমিটেড হোক, পরে ফাইন্যাল হিয়ারিং-এর সময় যদি দরকার হয়, একজন সিনিয়র নেওয়া যাবে না-হয়—'

'আমিও তাই বলি। সমাদ্দারই শুধু দোনা-মোনা করে। আমি বলি, প্রশান্ত আমাদের গ্রামের ছেলে, সাত রাজার রাজ্যে এমন মানিক মেলে না, ও একাই এক হাজার। জানো,' ভদ্রলোক আরো সন্নিহিত হলেন, 'কাল তো এসেছি, স্টেশনে নামতেই এক টাউটের সঙ্গে দেখা। সমাদ্দারকে বললাম, অমন উদোমাদা চেহারা করে নেমো না, পেছনে লোক লাগবে, বাঙাল ভাববে। ঠিক যা বলেছিলাম —'

'লোক লাগল?

'আর বলো কেন, প্রথম ভেবেছিলাম প্রাইভেট গাড়িকে ট্যাক্সি করতে এসেছে বুঝি। পরে মনে হল হোটেলের দালাল। শেষ কালে, স্বরূপে প্রকাশিত হল, উকিলের টাউট। ঠিক ধরেছে সমাদ্দারকে। যে গরু হারিয়েছে তার হাতে যেমন খুঁটো আর দড়ি দেখে চেনা যায়, তেমনি সমাদ্দারের হাতের কাগজপত্র দেখে লোকটা চিনল এ মামলায় হেরেছে। বললে, উকিল চাই? চলুন ফার্স্ট ক্লাস উকিল দিচ্ছি।'

'ফার্স্ট ক্লাস!' প্রশান্ত হাসল: 'যেন ফার্স্ট ক্লাস হোটেল।'

'আমি ধমকে উঠলাম।' বললেন ভদ্রলোক, 'বললাম আমাদের উকিল ঠিক আছে। আপনাকে দালালি করতে হবে না। লোকটা নাছোড়। বললে, কে উকিল? শরৎটা যা হ্যালাখ্যাপা, বললে, আমাদের উকিল প্রশান্ত সরকার, এম-এতে ফার্স্ট ক্লাস। রাখুন, লোকটা টিটকিরি দিল, ক-অক্ষর জ্ঞান নেই, তার ব্রহ্মবিচার। বলি এম-এ দিয়ে কী হবে, আইনে কদ্দূর? আমি থাকাতে লোকটা আর বেশি দূর সুবিধে করতে পারল না, কেটে পড়ল। নইলে শরতের মুণ্ডু প্রায় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। আমিই আজ ভোর হলে তাকে ঠেলেঠুলে কালীঘাটে পাঠালাম। বললাম, মাকে পূজো দিয়ে এস, মনটা ভালো হবে, মনে জোর পাবে, প্রশান্ততেও পারবে আস্থা রাখতে—

'ঠিক আছে। তবে এখন—' আরেকটা বজ্রগর্ভ ইঙ্গিত ছুঁড়ল প্রশান্ত।

'হ্যাঁ, খরচের একটা এস্টিমেট করো।'

'এর আবার এস্টিমেট কী—' তবু প্রশান্ত কাগজে আঁক পাতল।

খসড়ার দিকে এক নজর তাকিয়েই ভদ্রলোক উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'তোমার ফি-টা আরো দশ টাকা বাড়িয়ে নাও।'

'বাড়িয়ে নেব?' যেন কোন অভাবনীয়কে দেখছে এমনি চোখ বড় করল প্রশান্ত।

'হ্যাঁ, বাড়িয়ে নাও।' ভদ্রলোক আরো উত্তপ্ত হলেন: 'শরৎ অবশ্য বলছিল, গ্রামের লোক, ফি-টা একটু কম করতে বলবেন। আমি বললাম, ঠিক উলটো, গ্রামের লোক বলেই ফি-টা বাড়িয়ে দিতে হবে। গ্রামের লোককে যদি পেট্রোনাইজ না করো তো কাকে করবে? এ তো আর চিৎকেলে বটকৃষ্ণ ঘোষ পাওনি যে এক পয়সায় অক্রূরসংবাদ শোনাতে বলবে। তাই তোমাকে বলছি এই তক্কে বাড়িয়ে নাও ফি-টা—'

'বেশ, যা হয় দেবেন। কিন্তু টাকা কি—

'সব শরতের কাছে। ও কি কালীঘাট থেকে এ বাড়ি চিনে নিতে পারবে?' একটু বুঝি উন্মনা হলেন বটকৃষ্ণ: 'তাই ওকে কোর্টে যেতে বলেছি। কোর্টেই পেমেন্টটা করে দেব।'

'বেশ, আমি গ্রাউণ্ডস তৈরি করছি।' কাগজ-কলম টেনে নিল প্রশান্ত: 'একটা স্টে-র দরখাস্তও করতে হবে। শরৎবাবুকে দিয়ে একটা এফিডেভিট করিয়ে নিতে হবে। আমার মুহুরি এসে পড়বে এখুনি। হ্যাঁ, কোর্টেই সব হবে। আমার মুহুরিই ঠিকঠাক করে দেবে সমস্ত। আজ বুধবার—শুক্রবারই আর্জেন্ট য়্যাপ্লিকেশন শোনার দিন।' ত্রস্তব্যস্ত হয়ে উঠল প্রশান্ত, যেন ফাঁকা মাঠে বল পেয়ে ছুটতে গোলের দিকে: 'আজই আপিল ফাইল করে মুভ করে নিতে হবে যেন পরশু শুক্রবারটা না মিস হয়।'

'ঠিক আছে। অতি সুন্দর।' উঠে পড়লেন বটকৃষ্ণ।

'আপনি শরৎবাবুকে নিয়ে যত শিগগির পারেন চলে যান কোর্টে। এই যে—এই যে মুহুরিবাবু এসে গিয়েছেন। তবে আর কী, চিনে রাখুন মুহুরিবাবুকে—' মুহুরির দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত বললে, 'এদের একটা সেকেণ্ড আপিল—স্টে-র দরখাস্ত—এফিডেভিট—'

বটকৃষ্ণ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সাড়ে আটটা। মুহুরিকে লক্ষ্য করে মুরুব্বিয়ানা করে বললেন, 'আপনার বোধ হয় আরো কিছু আগে আসা উচিত। হাইকোর্টের উকিলের সকাল বলতে আর কতক্ষণ। যেন পদ্মপাতায় শিশিরের জলটুকু—সুতরাং—' আবার ঘড়ি দেখলেন বটকৃষ্ণ।

'হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ুন, দেরি করবেন না।'

'এখন ট্যাক্সি পাব আশা করি। সব কাঁটায়-কাঁটায় চলছে। চলা উচিত। শুধু মোকদ্দমার ফলটাই—' শূন্যের দিকে একবার চোখ তুলে বেরিয়ে পড়লেন বটকৃষ্ণ।

চারদিকে ত্বরার বিদ্যুৎ খেলতে লাগল।

শার্টে বোতাম নেই কেন, এ ময়লা কলারটা আবার দিয়েছ কেন, অন্তঃপুরেও ঝলস লাগল।

মধুশ্রী জিজ্ঞেস করলে, 'নতুন মোকদ্দমা পেয়েছ বুঝি?'

'হ্যাঁ, আমাদের গাঁয়েব বটকৃষ্ণবাবু নিয়ে এসেছেন। সিনিয়র উকিল, সদরে-মফস্বলে খুব নাম-ডাক। আর আমার উপরে তাঁর খুব বিশ্বাস। তুমিই শুধু আমাকে মানতে চাও না—'

'টাকা দিয়েছেন?'

'জানো আমার যা ফি তাব উপরে আরো দশ টাকা বেশি দেবেন। জেনে বাখো সে দশ টাকা তোমার।'

'দশ টাকা বেশি কেন?' স্বামীর পরা শার্টে বোতাম লাগাতে-লাগাতে জিজ্ঞেস কবলে মধুশ্রী।

'ওদের দেশের আমি বত্ন সেই পুরস্কাব।'

'বতনেই রতন চিনেছে।' সুতোব শেষ গিঁটটা দাঁত দিয়ে কাটল মধুশ্রী।

কোর্টে গিয়ে প্রশান্ত দেখল সব কাঁটায়-কাঁটায়। এভিডেভিট হয়ে গিয়েছে। ফাইলড হয়েছে আপিল। মুভ করা হয়েছে বেঞ্চকে। আগামী শুক্রবাবই দিন হয়েছে শুনানিব। আপিল য়্যাডমিটেড হবে কিনা। আব য়্যাডমিটেড হলেই স্টে। প্রতিপক্ষ শরৎ সমাদ্দারের বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতে যে ডিক্রিজারি কবেছে তা আপাতত বন্ধ।

'কিন্তু মক্কেল কই?' প্রশান্ত আব শান্ত থাকতে পাবল না।

'এ দিকেই তো ছিল।' খুঁজতে বেরুল মুহুবি।

আনাচে-কানাচে সিঁড়িতে-বারান্দার কোথাও পাওয়া গেল না।

'একবার বুড়ো বলেছিল বটে রাতে আপনার বাড়িতে যাবে।'

'দুটোই তো বুড়ো। কোনটা বলেছিল?'

মুহুরি মাথা চুলকে বললে, 'উকিল বুড়ো। বটকৃষ্ণবাবু।'

'তোমাকে খরচেব টাকা দিল কে?'

'মক্কেল। শরৎ সমাদ্দার।'

'তখনই আমার টাকাটা নিয়ে নিলে না কেন?'

'আমি কি জানি যে ফি বাকি আছে? আমাকে তো তখন বলেন নি।'

'যাক, রাত্রে আসবে বলেছে? তাই আসুক।' চিরদিন আশায় বাসা বাঁধা উকিলের, প্রশান্ত তাই সুতো ছাড়ল।

'না-এসে যাবে কোথায়?' মুহুরি বললে, 'মামলা তাহলে টেঁসে যাবে না? দু-দু কোর্টে হেরেছে। যদি প্রতিকার চায় আসতে হবেই।'

রাত্রেও কেউ এল না। না শরৎ না বটকৃষ্ণ।

একটা শব্দ নেই রেখা নেই, বৃহস্পতিবারের রাত্রি ভোর হল।

শুক্রবার সকালে প্রশান্ত বললে, 'নট-প্রেস্‌ড বলে রিজেক্টেড হয়ে যাক।'

'এ কী অসম্ভব কথা, ফি দেবে না মামলা চালাবে? কিন্তু,' মুহুরি মুখ-চোখ চিন্তিত করল: 'হঠাৎ কোনো বিপদ হয় নি তো?'

'তা হলে একটা খবর দেবে তো?'

'হয়তো সকালে কোর্টে টাকা নিয়ে উপস্থিত হবে।' মুহুরি আশ্বাস দিল।

শুক্রবার সকালেও নিষ্কলঙ্ক। বটমূলে কৃষ্ণও নেই আর শরৎ-শশীরও উদয় হল না।

কিন্তু তাই বলে পিটিশনটা মুভ না করার কোনো পয়েণ্ট নেই। আইনের এমন একটা ইন্টারেস্টিং পয়েণ্ট সে আবিষ্কার করেছে যেটা প্রত্যক্ষে জজেদের সামনে বলবার জন্যে মুখটা ভীষণ কুটকুট করছে।

বলবার জন্যেই তো উকিল হওয়া। মনের কথা মনে চেপে রেখে গোঁজ হয়ে বসে থাকবার জন্যে নয়।

টাকা না দিয়ে যাবে কোথায়? অন্য ব্যবসায় পারিশ্রমিক না দিক মামলা করে আদায় করা যাবে না কিন্তু ওকালতির পারিশ্রমিক মামলা করে উশুল করা চলবে। যেহেতু ওকালতি সবচেয়ে সাধু ও সম্মানিত ব্যবসা।

কে পক্ষে কে উকিল কোনো দিকে তাকাল না প্রশান্ত। মুভ করল দরখাস্ত। আইনের পয়েন্টটা একটু বিবৃত করতেই আপিল য়্যাডমিটেড হয়ে গেল। মঞ্জুব হল স্টে। নথি-তলব।

বিশুদ্ধ প্রবক্তার মুখে উচ্চারিত মন্ত্র অলৌকিক কাজ করল—সমস্ত দিন এমনি একটা ঝঙ্কাব অনুভব করল প্রশান্ত। টাকার কথাটা মনের কোণেও উঁকি মারল না। না বা দশ টাকার আশায় উজ্জ্বল মধুশ্রীব মুখটা।

শনিবার সকালে চিঠি এল বটকৃষ্ণের:

'বুধবার সন্ধ্যেয় তোমার বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু হোটেলে ফিরে এসেই টেলিগ্রাম পাই, স্ত্রীব কলেবা। বাত্রের ট্রেনেই রওনা হয়ে চলে এসেছি। অবস্থা এখন ভালোব দিকে, চিন্তার কারণ নেই। শরৎ সমাদ্দারকে বলে এসেচি বৃহস্পতিবাবেব মধ্যেই যেন তোমার টাকাটা পৌঁছে দেয়। আশা করি আপিল য়্যাডমিটেড কবিয়ে নিতে পারবে। তোমার অল্পদিনের প্র্যাকটিস, তা হোক, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমার হাতেই জয়লক্ষ্মী বাঁধা পড়ে আছে।'

প্রশান্ত লিখল:

'শরৎ সমাদ্দারেব আপিল য়্যাডমিটেড হয়েছে। ডিক্রিজারি বন্ধ আনটিল ফারদার অর্ডাবস। লোয়ার কোর্টে চলে গিয়েছে নির্দেশ। আমার ফি এখনো পাইনি। টাকা নিয়ে কেউ আসেনি আমার কাছে। মক্কেলকে বলবেন আমাব প্রাপ্য টাকা যেন অবিলম্বে পাঠিয়ে দেয় মনি-অর্ডাব করে।'

অনেক দিন কোনো উত্তর নেই।

ফার্স্ট—সেকেণ্ড বিমাইণ্ডার পাঠাল প্রশান্ত।

বটকৃষ্ণ লিখলেন ঃ

'শরৎ সমাদ্দারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে বললে, টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। তোমার পরের চিঠি পেয়ে আবার তাকে ধরলাম, সে আমাকে টাকা পাঠাবার পোস্টাল রিসিট দেখাল—তোমার ওদিকে টাকাটার কোনো গোলমাল হয়নি তো? তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার বাড়ির কোনো লোক টাকাটা রাখেনি তো? পরে তোমাকে বলতে হয়তো ভুলে গেছে—'

পাল্টা জবাব পাঠাল প্রশান্ত ঃ

'আমার টাকা অন্য লোককে দেবার কোনো অথরিটি নেই পোস্টআফিসে। পোস্টাল রিসিট না দেখিয়ে শরৎবাবুকে য়্যাক-নলেজমেণ্ট রসিদ দেখাতে বলুন। টাকা না পাঠিয়ে মিথ্যার অবতারণার কী হেতু বুঝতে পাচ্ছি না।'

এর উত্তরে বটকৃষ্ণ শরতের উদ্দেশে গালাগালের ফোয়ারা ছোটালেন।

'লোকটা মহা হারামজাদা। য়্যাকনলেজমেণ্ট দেখানো দূরের কথা, দেখাও দিচ্ছে না। লোক পাঠালে ভাগিয়ে দিচ্ছে। এখন শুনতে পাচ্ছি তীর্থে গিয়েছে। যে লোক এমন শঠ, প্রতারক, পরস্বাপহারী, তার তীর্থে কী হবে? তার বিষয়সম্পত্তির ভরাডুবি তো হবেই, সে নিজেও নিপাত যাবে।'

এর পরে আর করবার কী আছে, প্রশান্ত হাল ছেড়ে দিল।

কিন্তু নৌকো তক্ষুনি ডোবে কই?

শরৎ সমাদ্দারের আপিল মান্থলি থেকে ডেইলি লিস্টে উঠেছে।

বটকৃষ্ণকে লিখল প্রশান্ত ঃ

'এবার আপিলের ফাইন্যাল হিয়ারিং হবে। মক্কেলকে বলুন আমার দুবারের ফি পাঠিয়ে দিতে। নইলে আমি য়্যাপিয়ার করব না। আপিল যদি ডিসমিসড ফর ডিফল্ট হয়ে যায়, আমাকে দোষ দিতে পারবেন না।'

'না তোমার দোষ কী।' লিখলেন বটকৃষ্ণঃ 'ঐ হারামজাদা আমাকে ছেড়েছে। শুনছি তোমাকেও। শুনছি ফাইন্যাল হিয়ারিং-এ অন্য উকিল দেবে। তোমাকে যদি না রাখে, তোমার ন্যায্য ফি তোমাকে না দেয়, তুমি দাঁড়াবে কেন? মামলা যা হবার তা হবে, তোমার কী মাথাব্যথা! যে বিনা পয়সায় এত উপকার করল, এক কথায় আপিল য়্যাডমিট করিয়ে নিল, তাকে শেষ সময়ে বর্জন করার অকৃতজ্ঞতা ঈশ্বর কখনোই ক্ষমা করবেন না। হতভাগ্যকে বিষয়বিষে ধরেছে, ওব ক্যান্সার না হয় তো কী বলেছি!'

খোঁজ নিয়ে জানল আপিলেণ্টের পক্ষে আর কারু য়্যাপিয়ারেন্স নেই। যে-কে-সে, প্রশান্তই একমাত্র উকিল।

রেসপণ্ডেণ্ট য়্যাপিয়ার করেছে। আর তাদের পক্ষে জাঁদরেল সিনিয়র উকিল অবিনাশ বিশ্বাস।

'আমার ফি নেই, আমি দাঁড়াব কোন সুবোদে? বলে দেব, নো ইনস্ট্রাকশানস।' বললে প্রশান্ত

'তার আর কী করা।' সায় দিল মুহুরি।

কিন্তু যাই বলো, ল-পয়েণ্টটা ভারি ইনটারেস্টিং। আর্গুমেণ্টে আনন্দ আছে। রাত্রে ভালো করে ঘুমুতে পারল না প্রশান্ত। এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগল। এ পয়েণ্টটা ওকে ছেড়ে দিতে হবে? আপিল এডমিশনের সময় তো প্রতিপক্ষ আসেনি, এক তরফা ভাসা-ভাসা একটু বলেই প্রাথমিক কাজ হাসিল করেছে। কিন্তু এখন প্রতিপক্ষ যুদ্ধসাজে সেজে এসেছে, সশস্ত্র হয়ে এসেছে, এখন লড়তেই তো মজা, জিততে পারলে পরম রোমাঞ্চ। সামান্য কটা টাকার জন্যে এ রোমাঞ্চ ও ছেড়ে দেবে?

কিন্তু হতছাড়া মক্কেল ফি দেবে না, আর আমি বোকার মত আর্গুমেণ্ট করব ওকে জেতাবার জন্যে— আমার কি মানসম্মান বলতে কিছু নেই? আমাকে তো জীবিকার্জন করতে হবে, আর এই তো আমার একমাত্র পথ। আমাকে ঠকাবে, আমাকে শোষণ করবে?

কিন্তু, রোমাঞ্চটা ঠিক একটা কবিতার মত, গানের মত, নিটোল শিল্পসৃষ্টির মত মনে হতে লাগল প্রশান্তর। সে পয়েন্টটার ব্যাখ্যায় বর্ণনায় বিস্তারে বিশ্লেষণে যেন গানেরই সেই অস্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী ও আভোগের আস্বাদ। এ কি কখনো ছাড়া যায়? তার ওপরে ও পক্ষের ব্যাখ্যা-বর্ণনাকে নিরস্ত করে দেবার স্বপ্নের যে সুখ, বর্ণের যে ঝলক, তা সে আর পাবে কোথায়?

ফি না-পাই তো না-পাই, মামলায় দাঁড়িয়ে গেল প্রশান্ত।

প্রাণ ঢেলে আর্গুমেন্ট করল। কে শরৎ সমাদ্দার, কে বা বটকৃষ্ণ ঘোষ, পকেট তার ফাঁকা না বোঝাই, মধুশ্রীর পাতা হাতে দশ টাকা আছে কি নেই, কিছুই তার ভাবনার মধ্যে রইল না, সে গ্রন্থির পর গ্রন্থি উন্মোচন করে মন্ত্রপাঠ করতে লাগল—প্রতিপক্ষ দাঁড়াতে পারল না।

হু-হু কোর্টের হারা মামলা ডিক্রি হয়ে গেল।

একটা আগুন লাগা গানের মত হয়ে বাড়ি ফিরল প্রশান্ত।

মুহুরি বললে, মামলা জিতেছে, এবার পাঠাতে পারে টাকাটা। আবার একবার লিখুন বটবাবুকে।

না, আর লেখার মানে হয় না। অন্তত এর পরে আর নয়। লিখল না প্রশান্ত।

কত দিন পরে শরৎ সমাদ্দারের চিঠি এল।

বক্তব্য বিশেষ কিছুই নয়, মামলার যে ব্রিফটা প্রশান্তর কাছে ছিল তা যেন সত্বর পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

পত্রপাঠ ব্রিফ পাঠিয়ে দিল প্রশান্ত।

ব্রিফ দেখে শত টুকরো হয়ে ফেটে পড়ল শরৎ: 'আমি টাকা দিই নি? দু দুবারের টাকা, বাড়তি-বাবদ বাড়তি টাকা, সিনিয়রের টাকা—সমস্ত আমি বটকেষ্টর হাতে দিয়েছি। প্রশান্তবাবুকে না দিয়ে সিনিয়র না রেখে সমস্ত টাকা ও নিজে মেরেছে, আত্মসাৎ

করেছে। কী ভয়ঙ্কর কথা! তারপর আবার আমাকেই গালাগাল দিয়েছে। আমি যদি হারামজাদা হই ও কিসের জাদা? আমার তো ক্যান্সার হবে, ওর কী হবে?'

বটকৃষ্ণের কাছে খবর পৌঁছুল।

শুকনো মুখে বললেন, 'জানতাম প্রশান্ত খুব সতর্ক ছেলে, ওকে লেখা আমার চিঠিগুলো মামলার ব্রিফের মধ্যে রেখেছে কেন? আমার চিঠি তো মামলার বিষয়ের সম্পর্কে ইররেলিভ্যাণ্ট। এত বড় একটা আইনজ্ঞ লোক, আমার চিঠি কেন নথিভুক্ত করে? ও সব তো ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার, ও সব তো ওর ছিঁড়েখুঁড়ে নষ্ট করে দেওয়া উচিত ছিল। ওরা ব্রিফের পার্ট হয় কী করে?'

'ব্রিফেরই তো পার্ট।' বললে আরেক উকিল, 'মামলার থেকেই তো এ চিঠির জন্ম। আর বুদ্ধি করে ব্রিফের সামিল করেছিল বলেই তো চোর ধরা পড়ল।'

শরৎ সমাদ্দার সমস্ত কথা খুলে জানাল প্রশান্তকে। লিখলে, 'আমি বটার বিরুদ্ধে ফৌজদারি করব, আপনি সাক্ষী হবেন। আমার থেকে নিয়েছে এ আমি বলব আর আপনাকে যে দেয়নি এ আপনি বলবেন।'

তাগিদের পর তাগিদ আসতে লাগল, প্রশান্ত রাজি হয় না।

'এ পাপকে শাসন না করলে ঘোরতর অন্যায় হবে সমাজের। মিথ্যাবাদের পিরামিড এ লোকটাকে কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া নয়। ক্যান্সার ছেড়ে গ্যাংগ্রিন হলেও নয়। চুরিও করবে আবার গালাগালও দেবে এ অসহ্য। আপনি যদি রাজি না হন—'

প্রশান্ত লিখল: 'আমার এখানে নিত্য কাজ, আমি ভীষণ ব্যস্ত। সাক্ষ্য দেবার সময় নেই, সুবিধেও হবে না।' তারপরে যোগ করল: 'আপনি তো মামলা জিতেছেন। তাই সব কিছুকে জয়ের চোখে আনন্দের চোখে দেখুন—'

শুনে বটকৃষ্ণ হাসতে লাগলেন। বললেন, 'কাকের মাংস যে

কাকে খায় না, তা শরৎ সমাদ্দার জানবে কী করে? তা ছাড়া প্রশান্ত এখন উঠতি উকিল, তার অত টাকার খাঁই নেই। আর আমি জানি, আমাকে সে লিখেওছে, সে যে ল-পয়েণ্ট আর্গুমেণ্ট করে মামলা জিতেছে সে রোমাঞ্চ একটা গানের মত, কবিতার মত। তার কাছে টাকা কী। এ আমি জানতাম বলেই এ মামলা আমি প্রশান্তকে দিয়েছি, সিনিয়র পর্যন্ত রাখি নি। আজ তার কত নাম, কত প্রসার! শরৎ সমাদ্দার, একটা মক্কেল, এ সিক্রেট বোঝে এমন সাধ্য কী! এ একেবারে টপ সিক্রেট।'

আবার হাসতে লাগলেন বটকৃষ্ণ।

প্রমোশন

প্রথমে ছেলের পৈতেতে নেমন্তন্ন করতে এসেছিল।

'পৈতেতে এত ঘটা করছেন?' দেবরায় একটু বুঝি সঙ্কুচিত হল।

'ধর্মীয় অনুষ্ঠান না করে উপায় কী! কদিন পরেই আবার মেয়ের বিয়ে।'

'ওরে বাবাঃ, সে নিশ্চয় অনেক লার্জার স্কেল।'

'খরচের রাজস্যূয়।' পশুপতি সর্বহাবাব মত মুখ করল।

'কী করে ম্যানেজ কবেন?' অনুকম্পার চোখে তাকাল দেবরায়।

'ধারকর্জ করে। লাইফ ইনসিওবেন্স, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, কোনো কিছুই আর বাকি থাকবে না। একে আর ম্যানেজ করা বলে না। একে বলে তলিয়ে যাওয়া।' জলছাড়া মাছেব মত খাবি খেল পশুপতি· 'অতলে তলিয়ে যাওয়া। হঠাৎ কোনো একটা বড় রকমের লিফট না পেলে আব চলছে না, স্যার। ঐ যে নতুন পোস্ট একটা ক্রিয়েটেড হচ্ছে সেখানে তো আমাদেব ডিপার্টমেণ্টেবই লোক নেবে শুনছি। আপনি যদি স্যাব আমাকে একটু—' টেবলের উপর ছুটো হাত একত্র করল পশুপতি।

'আপনার মেয়ে কটি?' অন্য বিষয়ে চলে এল দেববায়।

'তিনটি।'

'কোনটিব বিয়ে হচ্ছে?'

'বড়টির।'

'তা হলে ছুটি আরো হাতে আছে।'

'দাঁড়িয়ে আছে।' চোখেমুখে আতঙ্কের ছায়া ফেলল পশুপতি: 'ছুটো মূর্তিমান অর্থব্যয়।'

'ছুজনেই বিবাহযোগ্যা?'

'বলতে পারেন, অরক্ষণীয়া। দুজনেই পড়ছে কলেজে। আর, সহজেই বুঝতে পারেন, এ মহাতাণ্ডবের খরচ কত। কত মণ তেল পুড়লে পর রাধা নাচতে ওঠে।' বিষয় বদলালে কী হবে, যে দৃশ্যেই আনুন সে দৃশ্যেই কান্নার সুর বার করতে পারবে পশুপতি : 'তারপর শুধু লেখাপড়া? মোটেই তা নয়। লেখাপড়ার উপরে আবার গানবাজনা। আপনি তো সবই জানেন, স্যার। খরচে-খরচে ভীষ্মের শরশয্যা। তা ছাড়া তিনটে ছেলে—'

ছেলেতে বিশেষ আগ্রহান্বিত নয় দেবরায়। জিজ্ঞেস করলে, 'গিন্নির স্বাস্থ্য কেমন?'

'অতি খারাপ।' যন্ত্রণাবিদ্ধ মুখ করল পশুপতি: 'ওষুধে-ডাক্তারেও খরচের হরিহরছত্র।'

বলতে না বলতেই টুক করে বিবেক দংশন করল। গিন্নিকেই যদি রুগ্ন করি, তা হলে দেবরায় যদি আসে, কে তাকে তখন আপ্যায়িত করবে? তাই কথাটা ঘোরাল পশুপতি. 'কৃশ মানুষ, কিন্তু একাই দুঃসাধ্যকে বহন করে চলেছেন। রোগ আর কী! অভাবই রোগ। তাই স্যার, যদি ঐ নতুন লিফটটা না পাই তা হলে কী করে স্ত্রী-কন্যাকে উপশম দিই, ওদের শীর্ণ মুখে হাসি ফোটাই—'

'আচ্ছা দেখি, যদি পারি, চেষ্টা করব যেতে।' প্রশ্রয়ের পৃষ্ঠায় ইতি-র রেখা টেনে দিল দেবরায়।

পৈতেতে গেল না। বিয়েতে গেল বটে কিন্তু কিচ্ছু খেল না। যারা খুব উচ্চপদের অধিকারী তারা যায় কিন্তু খায় না। যায়, বিনয় দেখাতে, কিন্তু খায় না, অনুকম্পায়। তখন বাড়ির মেয়েরা কেউ এগিয়ে আসে অনুরোধের থালা নিয়ে, 'অন্তত দই মিষ্টি? দুখানা ফ্রাই?'

পশুপতির স্ত্রী আর দুই অবিবাহিতা কন্যা এগিয়ে এল হাতে প্লেট আর জলের গ্লাস, কিন্তু দেবরায় নির্বিকার। রোদ, বৃষ্টি আর

রামধনু—অনেক সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা হল, কিন্তু যে আকাশ সেই আকাশ। একটুকু একটা আঁচলও গায়ে নিল না দেবরায়।

তখন পশুপতি বাড়িতে রবীন্দ্রজয়ন্তী করলে।

'আপনি স্যার, প্রধান অতিথি হবেন।' টেবলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল পশুপতি।

'আমি ও সবের কী জানি!' শতহস্ত হয়ে সরে গেল দেবরায়।

'কিছু জানতে হবে না, স্যার। বক্তৃতা-টক্তৃতা নেই। শুধু দেখা। আপনি শুধু দেখবেন। আপনি শুধু দেখার অতিথি। প্রধান বলে প্রধান অতিথি।'

'কী কী হবে?'

'শুধু একটা প্লে হবে। প্লে মানে নাটক হবে একটা।' একটু বা বুঝি বিশদ হল পশুপতি।

'কারা করবে?'

'আমারই বাড়ির ছেলে-মেয়েরা—'

'আপনার বাড়ির মেয়েরা মানে আপনার ঐ স্ত্রী আর দুই মেয়ে—'

'শুধু তারাই নয়, আমার ভাইঝি-ভাগনিরাও আছে। আমার ছোট দুই শালী আছে, শালার এক মেয়ে আছে, মানে এই সব—তাদের কাউকে আপনি দেখেন নি—'

'কী প্লে হবে?'

'গোরা।'

'সে আবার কী! গোড়ায় গলদ বলে একটা জানতাম!' প্রাজ্ঞের মত মুখ করল দেবরায়: 'সেইটেরই নাম বদলে—'

'না, এ একটা আলাদা বই। ঐ এক সাহেবের ছেলে হিন্দুর বাড়িতে এসে হিন্দু হয়ে গেল—তার গল্প। খুব ভালো বই, স্যার, ধর্মের বই, স্যার—'

'তা হলে যাব। কিন্তু বলে রাখছি, বক্তৃতা-টক্তৃতা দিতে পারব না।'

বক্তৃতা যা দেবার পশুপতিই দিলে। আর সে শুধু দেবরায়ের স্তবস্তুতি। দেবরায় কত সদাশয়, কত বড় মহাপ্রাণ, তারই আখ্যান-ব্যাখ্যান।

এততেও হল না কিছুই।

পশুপতি আর কী করতে পারে?

ক্ষীর ঘৃত দধি মধু কিছুই পাঠাতে পারে না সরাসরি। পাঠালেও নেবে না। আর, নিলেও হজম করে ফেলবে। বরং ছোবল মারবে উলটে। সাধুতা দেখাবে।

অন্তঃপুরে আলাপ করতে পাঠিয়েছিল স্ত্রী-কন্যাকে। কিন্তু মেমসাহেব বিশেষ আমল দেয়নি।

'কী একটা চাকরি খালি হয়েছে, ওঁকে—আমার স্বামীকে যদি—'

'সে সব আমি কী জানি।' বক্তব্যে কর্ণপাত করেনি মেমসাহেব।

যখন যেমন তখন তেমন খোশামোদ করছে পশুপতি, কিন্তু দেবরায়কে খোশমেজাজে আনতে পারছে না কিছুতেই।

দেবরায়ের নেকনজর কার উপর? কাকে সে সত্যি দিতে চায় চাকরিটা?

আর কাকে! অর্ধেন্দু ঘোষালকে।

অর্ধেন্দু ঘোষালের বিশেষ গুণ কী?

বিশেষ-অবিশেষ কিছু নেই, তার একমাত্র গুণ সে সিনিয়র।

শুধু জন্ম-তারিখের একটা অর্থহীন খামখেয়াল ন্যায়বিচারের মাপকাঠি হবে? স্বাধীন ভারতও যদি গুণ না দেখে, গুণানুসারে না তারতম্য করে, তবে কোন চুলোর দ্বারে গিয়ে দাঁড়াব?

সুতরাং অর্ধেন্দুর নিন্দে করো। কেচ্ছা কাটো। চুকলি খাও।

'ওর স্যার, দেবদ্বিজে এককড়া ভক্তি নেই।' মুখ গম্ভীর করে বললে পশুপতি।

'কার আছে বলুন।' গায়ে এতটুকু মাখল না দেবরায়।

'না, ও যে একেবারে ঈশ্বরই মানে না।'

'যা জানে না তা মানে না। সেকুলার স্টেটে সেইটেই তো করেক্ট অ্যাটিটিউড।'

'তাই বলে হিন্দুর ছেলে হয়ে, আপনার অধীনে কাজ করে—' পাগলের মত বললে পশুপতি।

'আত্মোন্নতি তো মানে।' হাসল দেবরায়: 'বলতে পারেন ঐ আত্মোন্নতিটাই ঈশ্বর।'

'ও স্যার, মদ খায়।'

'তা খাবার জিনিস খাবে, আমি তার কী করব।'

'তাই বলে মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে?'

'ধাত আছে, ছাড়াতে পারে মাত্রা। ওর স্বাস্থ্যকে তবে তারিফ করতে হয়।'

কিন্তু চরিত্রকে?' খিঁচিয়ে উঠল পশুপতি 'একটা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নার্সের সঙ্গে ও প্রেম করছে।'

'সেটা ওর স্ত্রী বুঝবে।'

'ওর রেকর্ড দেখুন, যৌবনে ও ব্ল্যাকলিস্টেড ছিল—'

'যৌবনে অনেকেই পশু থাকে, পরে পশুপতি হয়।'

এ বুঝি পশুপতিকেই প্রত্যক্ষ আঘাত। পশুপতি তপ্ত হয়ে উঠল: 'কিন্তু কেন, কেন আপনি আমাকে ছেড়ে ওকে প্রেফার করবেন?'

সংক্ষিপ্ত ও দৃঢ় উত্তর করল দেবরায়· 'ও আপনার সিনিয়র।'

'সিনিয়রিটির বিচার এককালে ব্রিটিশ আমলে ছিল। যেকালে আমরা শৃঙ্খলিত ছিলাম পরাধীন, ছিলাম—'

'সেইটেই আপাতচক্ষে ন্যায্য বিচার—'

'মোটেই না।' তপ্ততর হল পশুপতি: 'গুণের বিচারই আসল বিচার। স্বাধীন হয়ে আমরা চতুর্দিকে সেই গুণেরই মর্যাদা দিয়ে চলেছি। নইলে একটা অথর্ব অক্ষম বুড়ো শুধু সিনিয়রিটির জোরে উন্নতি করবে এ অসহ্য।'

'গুণের বিচার কে করবে? সে বিচার ভীষণ সূক্ষ্ম, প্রায় অতীন্দ্রিয়।' দেবরায় গম্ভীর হতে লাগল: 'বিকট কোনো অপরাধ প্রকটরূপে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত, সিনিয়রিটি ধরেই প্রমোশন হওয়া উচিত, যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে সবল ও সুস্থ রাখতে হয়। তাতে করে, আর যাই হোক, খাতিরের অভিযোগটা ওঠে না। আর যেখানে সকলেই এক গোয়ালের গরু, যেখানে হরে-দরে হাঁটুজল, সেখানে গুণের কথা মানে পিরীতের কথা। যাকে দেখছি ভালো তার সকল আলো, আর যারে দেখতে নারি তার চলন ভারী। তা ছাড়া,' তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল দেবরায়: 'তাছাড়া, অর্ধেন্দু মোটেই অথর্ব-অক্ষম নয়।'

'কিন্তু আমি—আমি তার চেয়ে মোটে এক প্লেস নিচে—আমি তার চেয়ে ঢের বেশি এফিশিয়েন্ট।' পশুপতি তার মুখোমুখি টেবিলে প্রকাণ্ড এক কিল মেরে বসল।

ভীষণ চটে উঠল দেবরায়। বললে, 'আপনি যে এত নির্লজ্জ হতে পারেন ভাবতে পারতাম না।'

'নির্লজ্জ আমি না আপনি?'

'তার মানে? আপনি আমার সাবর্ডিনেট, আর আমাকেই কিনা আপনি তম্বি করছেন, বুলি করছেন? জানেন এই প্রতিফল কী হতে পারে?' বাঁ হাতে চেয়ারে হাতল ধরে ডান হাতের তর্জনী দেখাল দেবরায়: 'জানেন এখুনি আপনার নামে প্রসিডিং করতে পারি?'

'কাঁচকলা করতে পারেন।' অঙ্গুষ্ঠ দেখাল পশুপতি। আর, আশ্চর্য, হাসতে লাগল। দেবরায় যে চটেছে, তাকে যে চটিয়ে দিতে পেরেছে এই যেন তার নিরবধি আনন্দ।

'যান, যান, আমার সমুখ থেকে বেরিয়ে যান বলছি।' গর্জে উঠল দেবরায়। তবু পশুপতি গড়িমসি করছে দেখে গলা আরো চড়াল: 'না বেরোবেন তো চাপরাশি নয়তো পাহারাওয়ালা দিয়ে বার করে দেব। যান, বেরিয়ে যান—'

মুহূর্তে একটা হই-হই পড়ে গেল। হন্তদন্ত হয়ে আসতে লাগল লোকজন।

পশুপতি চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়েছে দরজার দিকে। কিন্তু তবু দ্রুত পায়ে যাচ্ছে না বেরিয়ে, টালমাটাল করছে।

বোমার মত ফেটে পড়ল দেবরায়: 'আই সে গেট আউট! গেট আউট।'

দরজার কাছে এসে ভিড়ের মধ্য থেকে পশুপতিও উচ্চতর শব্দে বিদীর্ণ হল: 'হুং ফট্ স্বাহা।'

কে? কে এই শব্দ করল? এ কার, কার কণ্ঠস্বর?

দেয়াল মেঝে সিলিং ঘর বারান্দা চারদিকে উদ্‌ভ্রান্ত চোখে তাকাতে লাগল দেবরায়। মুহ্যমানের মত বসে পড়ল চেয়ারে।

দেবরায়ের পুরো নাম রাধাবিনোদ দেবরায় আর তার গুরুর নাম শর্বানন্দ সরস্বতী। আশ্রম পাতালপুরে। আর এই আশ্রমের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভক্তদের চাকরিতে উন্নতি করিয়ে দেওয়া। প্রসেস-সার্ভারকে জজ বানানো। রোগাকে দারোগা। .

ক্ষীর ঘৃত দধি মধু নিয়ে পশুপতি আশ্রমে উপস্থিত হল। অন্তরঙ্গদের নিয়ে নিভৃতে বসে ছিলেন গুরুদেব, তৃষাবিদীর্ণ বক্ষে তাঁর পা দুখানি জড়িয়ে ধরে হুমড়ি খাওয়া পশুপতি ডুকরে উঠল: 'বাবা, আমাকে দীক্ষা দিন।'

'হুং ফট্ স্বাহা।' সরস্বতী বিপুল বিকট গর্জন করে উঠল।

কী হল? জলজ্যান্ত অ্যাটম বম পড়ল নাকি? হকচকাল পশুপতি।

অন্তরঙ্গরা কানাকানি করে উঠল: 'বাবার এবার সমাধি হবে। ওটা বাবার সমাধিমন্ত্র।'

সরস্বতী কাঠ হয়ে বসলেন। দেখাদেখি অন্তরঙ্গরাও। পশুপতিও হাত পা পিঠ কোমর টান-টান করে আসনপিঁড়ি হয়ে বসল। বন্ধ করল চোখ। বন্ধ করল নিশ্বাস।

সমাধিশেষে পশুপতিকে নিয়ে একান্ত হলেন সরস্বতী।

'বেটা, তোর কী দুঃখ?'

তখন পশুপতি বললে সেই প্রমোশনের কথা।

'সমস্ত ব্যাপারটাই দেবরায়ের হাতে। কোনো কথাই শুনতে চায় না। কেবল রাগ করে।'

সরস্বতী হাসলেন। বললেন, 'করুক রাগ, কোনো ভয় নেই। রাগুক, রাগতে থাকুক, রাগতে-রাগতে চরমে উঠুক, শেষ পর্যন্ত আপনি চেঁচিয়ে উঠবেন, হুং ফট্ স্বাহা। সমস্ত রাগ, সমস্ত বিতৃষ্ণা, সমস্ত প্রাতিকূল্য ভস্মসাৎ হয়ে যাবে। শিখে নিন মন্ত্রটা। বশীকরণ, স্তব্ধীকরণ, উন্নতকরণ সব এই মন্ত্রে। বলুন হুং ফট্ স্বাহা—'

'লুং পট্—' পশুপতি চেষ্টা করল বলতে। প্লুত স্বর বার করতে।

'লম্পট নয়। হুং ফট্। হুং ফট্ স্বাহা।' অভয়প্রদ মুদ্রা রচনা করলেন সরস্বতী। বললেন, 'বলে দেখুন না কী হয়। চিচিং ফাঁকে যা হত তার চেয়েও অভাবনীয় বেশি হবে দেখবেন।'

পাগলের মত পাতালপুরে ছুটে এল দেবরায়।

ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে বসে পরীক্ষা করছিল, সরস্বতী ডাকলেন : 'বিনোদ!'

ভিজে বেড়ালটির মত মোলায়েম ভঙ্গিতে দেবরায় গুরুর পায়ের নিচে বসল।

'তোমাকে যে ডেকেছি বুঝেছ?' জিজ্ঞেস করলেন সরস্বতী।

'বুঝেছি। আকাশবাণী শুনেছি সেদিন।'

'হ্যাঁ, পশুপতিকে চেন?'

'পশুপতিকে চিনি না? পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্ধনি।'

'সে পশুপতি নয়। পশুপতি গাঙ্গুলি। তোমার যে সাব-অর্ডিনেট।'

দেবরায়ের মুখ কালো হয়ে গেল। বললে, 'হ্যাঁ, চিনি। তা, সে কী করেছে?'

'আমার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছে।'

'নিয়েছে ?' ঝংকৃত হল দেবরায়।

'সমান গুরুব থেকে দীক্ষা নিলে দীক্ষিতরা কী হয় ?

'গুরুভাই হয়।'

'আর ভাইকে কে দেখবে ?'

'ভাই।'

'সুতরাং নতুন চাকরিতে প্রমোশনটা কাব প্রাপ্য ?'

'আপনি যখন বলছেন তখন আর কথা কী, পশুপতির প্রাপ্য।' গুরুদেবের পা দুখানি দেবরায় নিজেব কোলের মধ্যে টেনে নিল: 'আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। আমি কালকে অফিসে গিয়েই অর্ডারটা বের কবে দিচ্ছি।'

অর্ধেন্দু জেনেছে তার হল না। সেও পাতালপুরেব আশ্রমে যাবে ঠিক কবেছে। ঠিক কবেছে দীক্ষা নেবে। প্লুত স্বরটা বেব কবতে পাবছে না এখনো। আসন কবছে। তাব মানে, সমানে ওঠ-বস করছে আব কাষ্ঠকণ্ঠে আওয়াজ কবছে: হুং ফট্ স্বাহা! হুং ফট্ স্বাহা!

'আর কাকে সন্দেহ করেন ?'

'আর কাকে করব ? নাম তো বললাম।' তারক বিমূঢ়ের মত তাকাল।

'সে তো যারা মারপিট করেছে।'

'হ্যাঁ, দেবেন আর মোহিনী আর—'

'তা তো নিয়েছি লিখে।' ইন্দু দারোগা মুখটা ছুচলো করল 'বলি আর কারু নাম ঢোকাতে চান না ?'

বোকার মতন মুখ করে তাকিয়ে রইল তাবক।

'কেউ শত্রু নেই আপনার ?' ইন্দুভূষণ পেন্সিল দিয়ে ঠোকর মারল টেবিলে।

'বা, কত শত্রুই তো চারদিকে।'

'বলি শাঁসালো শত্রু কেউ নেই ?'

'শ াসালো ?'

'হ্যাঁ, মশাই। যার টাকাপয়সা আছে, মানসম্মান প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে—'

'তা আশু ঘোষই তো আছে।'

'তাকে জড়ান না।'

'জড়াব ? সে তো বুড়ো—' আবার হাবাগোবা মুখ করল তারক।

'আমি কি আর তাকে আলিঙ্গন করতে বলছি', চোখ একটু ছোট করল ইন্দু: 'বলছি তাকে মামলায় ঢুকিয়ে দিন। লিখুন, তার সাক্ষাতে না হোক তার প্ররোচনায়ই ঘটেছে মারপিট।'

'প্ররোচনায় ? তা—তা একরকম বলা যায় বই কি!' তারক নিশ্বাস ছাড়ল।

'তবে তাই লিখে দিন। জানলা-ঘুলঘুলি সব বন্ধ করে দিলে চলে কী করে?' পেন্সিলের ডগা দিয়ে কান চুলকোলো ইন্দু: 'আমাদেরও তো পোষানো দরকার।'

আশু ঘোষকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

আশু ঘোষ সাত হাত জলের নিচে পড়ল। এটা কী হল? বাম্পার, না, বীমার? কার পিণ্ডি কার ঘাড়ে এনে চাপাল?

তার ছোট ভাই অনুতোষ জামিনে খালাস করে আনল আশুকে। তখনই ইন্দু দারোগার লোক টিপে দিল, কিছু হাত-চুলকানি দিলেই ছাড়া পায় বেকসুর।

বাড়ি গিয়ে দাদার কানে কানে বললে কথাটা।

'খবরদার।' হুঙ্কার দিয়ে উঠল আশুতোষ।

'কিন্তু—'

'যা হয় হবে। পারব না দিতে-থুতে।'

ফল কী হল। চার্জ শীট হল আশুর বিরুদ্ধে।

সব দ্রুত ও সংক্ষেপ করা হচ্ছে, তাই নিচুতলার হাকিম কী কটা এদিক-সেদিক সাক্ষী নিলে ও কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করলে আর সরাসরি অন্য আসামীর সঙ্গে আশু ঘোষকেও দায়রায় সোপর্দ করলে।

ইন্দুভূষণের লোক বললে, 'এখনো দেখুন।'

'এখন আর কী দেখবার আছে!' অনুতোষ বললে, 'যা হবে বিচারে হবে, কোর্টে হবে।'

বাড়ি এসে দাদাকে বললে, 'এখন তবে ডিফেন্সটা ঠিক করতে হয়।'

'খবরদার।' আবার হুঙ্কার ছাড়ল আশুতোষ: 'আমি লড়ব না মামলা।'

'লড়বেন না!'

'না। গিলটি প্লিড করব। জেলে যাব। যেখানে বিচারের এই ছিরি, এই ব্যবস্থা—'

এ কি একটা কথা হল? শুধু-শুধু খোলা তলোয়ারের নিচে কেউ মাথা পাতে?

আশুতোষের স্ত্রী জয়ন্তী কেঁদে পড়ল। 'যে করে পারো বাঁচাও। যত টাকা লাগে আমি দেব।'

অনুতোষ বললে, 'দেখি। এসব লাইনে হাঁটিনি কোনো দিন। দেখি কোথায় কী আছে।'

প্রথমেই এক উকিল ধরতে হয়।

উকিল.ধরে কী করে?

উকিল ধরতে টাউট লাগে।

টাউট পাই কোথায়?

বাজারে, রেল-ইস্টিশানে, পানের দোকানে, বটতলায়, আদালতের আনাচে-কানাচে। কে উকিল খুঁজছে চেহারা দেখলেই বুঝি বোঝা যায়। গণেশ টাউট অনুতোষের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কী মশাই, সিভিল না ক্রিমিন্যাল?

সেসনটা কোন গোত্র কে জানে। বিবরণটা সংক্ষেপে ব্যক্ত করল অনুতোষ।

'বলেন কী মশাই, আশু ঘোষ আসামী?' গণেশ পর্যন্ত উলটে যাবার দাখিল।

নিয়ে গেল চিত্ত উকিলের সেরেস্তায়।

চিত্ত বোস দেখল, এ তো চুনোপুটি নয়, দেড়মনী কাতলা।

বললে, 'সিনিয়র লাগবে।'

'যা লাগবে লাগুক।' বললে অনুতোষ, 'খরচপত্রে কার্পণ্য করব না। যে করে হোক খালাস করে আনতেই হবে। পাগল হয়ে যাবেন সতী স্ত্রী। নির্দোষও যদি ছাড়া না পায় তা হলে আর বিচার কী, সূর্য-চন্দ্র কী।'

চিল যেন বিল পেয়েছে, অঢেল খুশী হল চিত্ত। বললে, 'সব ফ্রণ্টেই লড়তে হবে। মক্কায় তো বটেই, বেমক্কায়ও।'

এটা এখন রঘু টাউটের এলাকা। গণেশ দেওয়ানীর দালাল, রঘুকে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে পড়ল। চোরের লাভ রাত্রিবাস, যা এক মুঠো পেয়েছে তাই গণেশের বেশি।

রঘু প্রথমে নিয়ে গেল আমলার কাছে।

'আগে পাবলিক প্রসিকিউটর ঠিক হোক।'

'হোক।' সায় দিল অনুতোষ।

'তবে দিন ভারী হাতে—'

'এটা তো আপনা থেকেই হবে।'

'তা হবে। কিন্তু আপনার বিপক্ষে একটি কমবুদ্ধি আনাড়ি রকমের পাবলিক প্রসিকিউটর হলেই কি সুবিধের হয় না?'

'ও হ্যাঁ, তা হয়।' পলকে বুঝে নিল অনুতোষ। দিল যা দেবার।

'আর এই থেকে যদি মজবুত কেউ এসেও পড়ে প্রসিকিউশনে,' রঘু বললে, 'ঠিক-ঠিক উকিল দাঁড় করাব। যেমন ওল তেমনি তেঁতুল।'

'তার মানে?' অনুতোষ যথারীতি বোকার মত মুখ করল।

'তার মানে,' আমলা বললে, 'যার সঙ্গে চুক্তি তার সঙ্গেই কুস্তি। ভাব দেখাবে লড়ছে, কিন্তু তলে-তলে নৌকো ফুটো।'

ফরিয়াদীর পক্ষে উকীল ঠিক হল কেশব দাস। অনুতোষ খোঁজ নিয়ে জানল পাকা উকিল।

তবে কী হল তদবিরে?

'কিচ্ছু না।' হুঙ্কার ছাড়ল আশুতোষ। 'আমলায় খেয়েছে।'

'কেশব দাস? অত ঘাবড়াবার আছে কী!' আশ্বাস দিল রঘু। ডিফেন্স তবে কুলদা মিত্তির। যেমন বিষ তেমনি ওঝা।'

চিত্ত বোস অনুতোষকে নিয়ে এল কুলদার চেম্বারে।

কুলদার শুধু ফি-ই মোটা নয়, চশমার ফ্রেম মোটা, চুরুট মোটা, ফাউণ্টেন পেন মোটা। কিন্তু বুদ্ধি সরু।

টাকা দেবার পরেও কুলদা নথি দেখছে না।

'বলি মশাই সাক্ষী ভাঙাতে পারবেন? জুরি তদবির করতে পারবেন? নচেৎ মিছিমিছি নথি দেখে লাভ কী?'

'তা কোথায় কী ক'রতে হবে—' ইতি-উতি তাকাল অন্নুতোষ।

'ওসব আগে ঠিক করে বনেদ পাকা করুন। তারপর দেখাই কাকে বলে অ্যাডভোকেসি। কাকে বলে জুরি-অ্যাড্রেস।'

'কোথায় যেতে হবে?'

এর পরে আর রঘু নেই। এর পরে জুরির তদবিরকার। সে অন্য লোক। তার নাম গজানন।

রঘু নিয়ে এল গজাননের কাছে।

গজাননের এলাকা নেপথ্যে, অদৃশ্যলোকে। সে কোর্টে ঘোরে না, সে ধোবে হোটেলে, বাস-স্ট্যাণ্ডে, চায়ের দোকানে, সিনেমায়, নয় তো বাড়ি ফিরে যাবার নির্জন রাস্তায়। সে অন্ধকারের জীব, তার এক চোখে নিরিবিলি আরেক চোখে চুপি-চুপি।

গজানন বললে, 'ট্রায়াল শুরু হোক। জুরির লটারির পর দেখি কে ফোরম্যান হয়।'

কাঠগড়ায় অন্য আসামীদের সঙ্গে আশু ঘোষও এসে দাঁড়াল।

লোক ভেঙে পড়ল। এত বড় একটা ধনী-মানী লোক, সে কিনা সোপর্দ হয়েছে! ব্যাপার কী? হয়েছে কী? খুন? ব্যাঙ্ক-লুট? বলাৎকার?

আই-ও তাকাল আশুর দিকে। ভাবখানা এই, তখন কেন কিছু করেন নি? এখন মজা দেখুন।

সে ঈশ্বর দেখবেন। আশু ঘোষ মুখ ফিরিয়ে রইল।

কিন্তু অন্নুতোষ পারল না মুখ ফেরাতে। রামের বনবাসে লক্ষ্মণের নিষ্ক্রিয় থাকবার জো নেই।

জুরি লিষ্টীকৃত হল। বটকৃষ্ণ ঘোষ ফোরম্যান।

দুপুরে গজানন বললে, 'বটবাবুকে বাগিয়েছি বহু কষ্টে। চার

শো টাকায় রফা হয়েছে। সস্তাই বলতে হয়। ছ জন জুরি পঞ্চাশ টাকা করে আর বটবাবু এক শো। সব টাকাটাই বটবাবুর হাতে একমুষ্টে দিতে হবে।'

'তাই হবে। কিন্তু টাকাটা আমি নিজে দেব।' বললে অনুতোষ।

'তাই দেবেন। বটকৃষ্ণের হাতে পৌঁছুনো নিয়ে কথা।'

'কিন্তু কোথায় দেব?'

'তাও ঠিক করে এসেছি। তরুছায়া হোটেলটা চেনেন তো? তার নিচের তলায় উত্তরের ঘরের জানলার কাছে বটবাবুর সিট। কথা হয়েছে রাত দশটা নাগাদ যাবেন। দেখবেন বটবাবু কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে, শুধু একটা হাত জানলার দিকে বার-করা। সেই হাতের মধ্যে নোটের তাড়াটা গুঁজে দেবেন।'

'মুখ দেখাবে না বুঝি?'

'কী করে দেখায়। শত হলেও লজ্জার ব্যাপার তো।'

ঘুম-ঘুম হোটেল ও তার চারপাশ, ঠিক রাত দশটায় হাজির হয়েছে অনুতোষ।

হ্যাঁ, এই তো সেই উত্তরমুখো নিচের ঘর। এক পলকের জন্যে অনুতোষ টর্চ টিপল। সব একেবারে পটে আঁকা। নিখুঁত।

কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছে বটকৃষ্ণ, তার একটা হাত জানলার দিকে বার করা, বাড়িয়ে ধরা। নির্লিপ্ত। নিরাসক্ত।

নোটের তাড়াটা গুঁজে দেবে, হঠাৎ কী খেয়াল হতে অনুতোষ কম্বল ধরে এক টান মেরে বসল।

ও হরি! বটকৃষ্ণ কোথায়, এ যে স্বয়ং গজানন।

চোর! চোর! হোটেল থেকে সমবেত একটা চিৎকার উঠতে না উঠতে প্রাণপণ ছুটে পালিয়ে গেল অনুতোষ।

পরদিন চিত্ত উকিলকে সব বললে।

চিত্ত বোস বিচলিত হল না। বললে, 'বেশ, জুরি তদবির না হয়,

আমরা হাকিম তদবির করব। হাকিমকে বাগাতে পারলে জুরি কী করবে?'

সে আবার কী সর্বনাশ কে জানে।

'লাগবে কত?' কাঁচুমাচু মুখে জিজ্ঞেস করলে অনুতোষ।

'হাজার খানেক। একটা সম্মান আছে তো? ভয় নেই, আমি নিজে ওঁর বাড়ি গিয়ে দিয়ে আসব।' চিত্ত অন্তরঙ্গ হল: 'রুলিং-এর বই দিচ্ছি বলে বইয়ের মধ্যে গুঁজে দেব এনভেলাপ।'

এতগুলি টাকা! অনুতোষ আশুতোষকে জানাল।

'খবরদার দিসনি।' আশু ঘোষ গর্জে উঠল: 'বইয়ের মধ্যে শুধু এনভেলাপ যাবে। টাকা যাবে চিত্তের পকেটে।'

'দেখি কুলদা মিত্তির কী বলে!' তবু অনুতোষ গড়িমসি করতে লাগল।

'ওসব ধরে কিছু হবে না।' আশু ঘোষ উপরের দিকে তাকাল: 'আসলকে ধর।'

'যদি হয় খোদকারিতে হবে, খোদা ধরে তো দেখলে এতদিন।'

'দেখেছি।' আশু ঘোষ বুনো গোঁ ধরল: 'আমি যাব না কোর্টে।

'সে কী!' চোখে আঁধার দেখল অনুতোষ: 'জামিন জব্দ হবে। ধরে নিয়ে গিয়ে জেল হাজতে পুরবে।'

'নিক। পুরুক। তবে আর কোর্টে কেন, যেখানে যাবার সেখানে যাব।'

আশু ঘোষের মাথা খারাপ হয়েছে। স্ত্রীর কান্নাতেও টলল না। অনুতোষ যেমন যায় তেমনি গেল। কোথাকার শ্রাদ্ধ কোথায় গিয়ে গড়ায় কে জানে।

অনুতোষ কোর্টে গিয়ে দেখল, অভিনব। পি-পি কেশব দাস দরখাস্ত করছে আশু ঘোষের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেবার অনুমতি চাই।

কোর্ট দিয়ে দিল অনুমতি।

আশুতোষ ঘোষ খালাস। যে খালাস তার আবার কোর্টে হাজির হবার কী দরকার!

আশ্চর্য, ঠিক তাক বুঝেই তো আসেনি আশু ঘোষ।

সবাই বললে, অঘটন আজো ঘটে। দেখ, দেখ ঈশ্বরবিশ্বাসের পুরস্কার।

'না, না, মোটেই ওসব কিছু নয়।' আশু ঘোষ বললে বুক ফুলিয়ে, 'আমি খোদাকে ধরিনি, আমি খোদকে ধরেছি।'

শুম্ভ-নিশুম্ভ

পরান মামলা করেছে হারানের নামে।

নদী-নালার দেশ, শুধু নৌকো চলে পাল ফুলিয়ে। পালকি-ডুলি নেই, গরুর গাড়ি নেই।

বছরের খোরাকির উপর বাড়তি কিছু ধান পেয়েছে হারান। সাধ হয়েছে হাটে গিয়ে বেপার করবে। ধান বেচে নগদ টাকায় নৌকো কিনবে একখানা।

হারানের নৌকো নেই। একখানা নৌকো না হলে আর চলে না।

কিন্তু এখন হাটে সে যায় কি করে? হাটে যেতে হলেও তো নৌকোর দরকার।

কারু কাছ থেকে যেচে-মেগে নিতে হয়! ভাড়া করবার মতো তার অবস্থা কোথায়!

কিন্তু কে তাকে মাগনা দেবে জিজ্ঞেস করি? কেন, পরান। পরান তার বেয়াই। পরানের ছেলের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে হয়েছিল। ছেলে-মেয়ে কেউ আর বেঁচে নেই বটে, কিন্তু তাই বলে তাদের সম্পর্কটা তো উবে যায়নি একেবারে। তা ছাড়া ঘাটে কামাই যাচ্ছে পরানের নৌকো, একবেলার জন্যে দেবেনা কেন?

হারান গিয়ে নৌকো চাইল। পরান এক কথাতেই রাজি। একবেলার জন্যে হাটে যাবে ধান বেচতে, তাতে আর আপত্তি কি। না, না, ছি-ছি, এর জন্যে আবার ভাড়া! সংসার থেকে দয়া-ধর্ম কি উঠে গেছে?

সেই পরান মামলা করল হারানের নামে। একবেলার নাম করে নৌকো নিয়ে গিয়ে একমাসের মধ্যে ফেরাবার নাম নেই।

মায়-সরঞ্জাম নৌকো সে গাপ করেছে। নৌকোর দাম তুশো টাকা। সে ক্ষতিপূরণ চায়।

হারান জবাব দিল। যা-যা বলছে পরান, সব মিথ্যে, বানানো কথা। নৌকো-টৌকো কিছুই সে নেয়নি তার থেকে। পরান যেমন হাড়-কিপটে সে বিনি-পয়সায় নৌকো ছাড়বে এ অসম্ভব কথা। তার নৌকো ঘাট থেকে চুরি গেছে সেই মর্মে সে এজাহার করেছে থানায়। এখন যেহেতু চোর ধরা যাচ্ছে না, পাশে আছে হারান, তাকে পাকড়াও। বাড়তি কিছু ধান পেয়েছে সে এবার, সুতরাং চোখ টাটাচ্ছে।

কিন্তু মিছে-মামলার হেতু কি ? শেষ প্যারাগ্রাফে তাও লিখেছে হারান। যেকালে তারা বেয়াই ছিল, বৌ-জামাই নিয়ে আকচা-আকচি ছিল তাদের মধ্যে। সেই আক্রোশ পরান এখনও পুষে রেখেছে।

তুই পক্ষ মার-মার কবতে-করতে আদালতে এল।

ওরা বসল এপারের বটতলায়, ওরা বসল ওপারের অশথতলায়। কারুর গামছাই আজ কাঁধের উপর খোলা নেই, এদের বাঁধা মাথায়, ওদের বাঁধা কোমরে।

ডাক পড়ল মোকদ্দমার।

পরানের পক্ষে উকিল প্রিয়লাল ঘোষ, আর হারানের পক্ষে উকিল প্রিয়রঞ্জন গোস্বামী। প্রিয় ঘোষের চশমাটা নাকের ডগায় থাকে, প্রিয় গোস্বামীরটা থাকে কপালেব উপব।

সর্দি হলে হাঁচি ঠেকাতে গেলে নাকের যেমন চেহারা হয়, তেমনি একটা চেহারা করতে-না-করতেই ঘোষের চশমাটা নাকের গোড়ায় উঠে আসে, মনে হয় নাকে যেন একটা দ্রুত ইস্ক্রুপের প্যাঁচ দিলে। আর গোস্বামীর হচ্ছে উলটো। খুব বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়েছে চোখে-মুখে এমনি একটা ভাব করতে গেলেই তার কপালটা কুঁচকে যায় আর সেই কোঁচকানিতে চশমাটা সুড়ুৎ করে নাকের দাঁড়ে নেমে আসে। তুজনেই বজ্রকণ্ঠ। ব্যাঘ্রমুষ্টি।

তুজনেই সাক্ষী সাজিয়েছে ডজনখানেক করে। তু পক্ষেরই উকিলের নির্দেশ। সাক্ষী বেশি হলেই মামলা বেশি দিন চলবে। পক্ষদের ঝগড়ার নেশাটা ভালো করে জমে উঠবে—আর, হেঁ-হেঁ, দিন যত লম্বা হবে উকিলদেরও তত পয়সা।

পরানের পক্ষে সাক্ষী বারো জন।

(১) নৌকো নেবার চুক্তির সময় যারা ছিল—৩

(২) ঘাট থেকে হারানকে যারা নৌকো খুলে নিয়ে যেতে দেখেছে—৪

(৩) সেদিন হারানকে যারা হাটে যেতে দেখেছে নৌকো করে, প্রশ্নের উত্তরে হারান বলেছে এ পরানের নৌকো, চেয়ে নিয়ে এসেছে একদিনের কড়ারে—৩

(৪) পরদিন ও পরের পরদিনও যারা পরানের নৌকোকে বাঁধা দেখেছে হারানের ঘাটে—২

আর হারানের পক্ষে সাক্ষীর নম্বর চৌদ্দ।

(১) সেদিন হারানের ঘোরতর জ্বর ছিল যারা দেখেছে, কবরেজ সমেত—৩

(২) যারা জানে হারান নৌকো বাইতে পারে না—২

(৩) যারা জানে হারানের মোটে তিন বিঘে জমি, বছরের খোরাকির ধানই আসে না—২

(৪) ঐ দিনে ঐ গ্রামে যে হাটই বসে না ঐ গ্রামের হাটুরে যারা জানে—৩

(৫) হারানের যে ঘাট নেই, নদী যে তার বাড়ি থেকে অনেক দূরে এ যারা জানে এ গ্রামের লোক—২

(৬) পরানের সঙ্গে হারানের যে একটা বিতণ্ডা হয়েছিল যার ফলে হারানকে পরান শাসিয়েছে এ যারা দেখেছে—২

তুমুল ঝড় উঠে গেল। তুমুল সমুদ্রগর্জন।

যেন ধোপা কাপড় কাচছে, কামার লোহা পিটছে, তাঁতি মাকু ছুঁড়ছে, চলেছে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, জেরার পর জেরা। একেকটা সাক্ষী তুলো ধোনা হচ্ছে তবু জেরার বিরাম নেই। ক্রমে-ক্রমে উকিলদের জেদ চড়ে যাচ্ছে। তাদের আসল হাকিম সামনে নয়, পিছনে—যার যে পক্ষ সেই তার হাকিম। তাদেরই কথায় তারা উঠছে-বসছে, চেঁচাচ্ছে, শূন্যে ঘুষি ছুঁড়ছে। হাটে কার হাঁড়ি ভাঙা যায়, কাদা ছুঁড়ে কাকে ঘায়েল করা চলে, কানে-কানে শুনে নিচ্ছে তারই মন্ত্রণা।

দেখতে-দেখতে ঝগড়াটা পক্ষ ছেড়ে উকিলদের মধ্যে সংক্রামিত হল।

প্রিয় গোস্বামী বললে, 'এসব অবান্তর কথা।'

প্রিয় ঘোষ উত্তর দিল: 'এর একটাও অবান্তর নয়। কোন কথা অবান্তর তা বুঝতে হলে বিদ্যে-বুদ্ধির দরকার হয়।'

'হয় বলেই তো বলছি।' গোস্বামী টিপ্পনি কাটল: 'তিনবাবে যে বি-এ পাশ করে আর ল পাশ করতে যার ন বছব লাগে তাব বিদ্যে-বুদ্ধি সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। (বলা বাহুল্য, প্রিয় ঘোষ পরীক্ষা-সমুদ্রে অনেকবার খাবি খেয়েছে।)

'তবু পরীক্ষার হলে বই দেখে চুরি করিনি। ঘাড়কাতা খেয়ে বার হয়ে যাইনি। তারপরে গিয়ে গার্ড ঠেঙাইনি। ঐ তো সব বিদ্যেবুদ্ধির নমুনা।' ঘোষ তেরিয়া হয়ে উঠল।

(এই ইঙ্গিতটা গোস্বামীর ছেলে রাখালের প্রতি। সে গত বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষায় টুকতে গিয়ে ধরা পড়েছে, বার হয়ে গেছে হল থেকে, পরে রাস্তায় লোহার ডাণ্ডা দিয়ে গার্ড ঠেঙিয়েছে।)

তারপর যখন একবার চুরির কথাই উঠল তখন আর রক্ষে নেই। কে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হয়ে শহরের রাস্তার আলো থেকে কেরোসিন তেল চুরি করছে (প্রিয় ঘোষ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান) আর কে ফুড-কমিটির সেক্রেটারি হয়ে চাল-ডাল-চিনি-

আটা বেমালুম হজম করছে (প্রিয় গোস্বামী ফুড-কমিটির সেক্রেটারি) চলল তার ব্যাখ্যা-বিবরণ। কে কবে মক্কেলের টাকা মেরেছে আর কে কবে কোন গুরুভাইয়ের গচ্ছিত টাকা ফেরত দেয়নি। কে কবে কোন দারোগাকে ঘুষ দিয়েছে আর কে কবে কেঁদেছে সেই দাবোগারই পায়ে ধরে। কে নামাবলী গায়ে দিয়ে কপালে তিলক কেটে খোল বাজায়, অথচ এদিকে নৃশংস ভাবে প্রজাপীড়ন করে; আব কে খদ্দর গায়ে দিয়ে স্বদেশী-স্বদেশী করে অথচ এদিকে আসলে একজন পাক্কা খয়ের খাঁ। কার বাড়িতে কটা গুণ্ডা, কটা অকালকুষ্মাণ্ড। কার গুষ্টি পাগলের, কার বা মাতালের।

চলল মহাসংকীর্তন। নামযজ্ঞ।

ঘোষ বললে, 'আমি আদালতের আশ্রয় চাই।'

গোস্বামী বললে, 'আমিও।'

হাকিম বললে, 'নাবদ! নারদ!'

তারপবে উঠল আশ্রয়েব কথা। কে কবে তার দুঃস্থা বোনকে আশ্রয় দেয়নি, কে কবে তাব বিধবা ভ্রাতৃবধূকে তাড়িয়ে দিয়েছে চলল তার ফর্দ-ফিবিস্তি। পক্ষেব মামলা তখন উকিলে এসে বর্তেছে।

ঘোষ বলছে, 'মানহানি।'

গোস্বামী চোখ পাকিয়ে বলছে, 'বাইবে চলো না, নির্ঘাত প্রাণহানি।'

ঘোষ বলছে, 'জানি কি কবে শায়েস্তা করতে হয় তোমাকে।'

পালটা গোস্বামী বলছে, 'আমাবো জানা আছে কি করে নাকে খৎ দেওয়াতে হয় তোমাকে।'

এ যদি টেবিল চাপড়ায়, ও তবে ঘুষি মাবে। এ যদি বই ছোড়ে টেবিলে, ও ছোড়ে মেঝের উপর। এ যদি চেঁচায় ইঞ্জিনের মতো, ও চেঁচায় যেন সাইরেন। এ যদি মুখ ভেঙচায় ও তবে বক দেখায়।

পরান-হারান কিন্তু খুব খুশি। তাদের উকিলরা যেমন লাফায় তারাও তেমনি নৃত্য করে।

পরান বলে, 'জিতে গিয়েছি মামলা। কেমন তুড়ে দিয়েছে ও-পক্ষের উকিলকে—মুখে চুন-কালি লেপে দিয়েছে।'

'রাখ্, ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচ করে কেটে নুন ঘষে দিয়েছে।' হারান ভেঙচে উঠল: 'তোর উকিল অমন চেঁচাতে পেরেছে আমার উকিলের মতো? আর বলে দিতে হবে না কার জিত হবে মামলায়।'

শোনা গেল মুলতুবি হয়েছে মামলা। বাকিটা কাল হবে। উকিলদের মেজাজ আগে ঠাণ্ডা হোক।

ঠাণ্ডা হতে দিলে তো! আরো টাকা দেবে পরান। আরো টাকা দেবে হারান। বিপক্ষকে যখন নাশ করতে হবে তখন বিপক্ষের উকিলকেও নাশ করতে হবে। এ আগুন কি আর নিভতে পারে? আজ যদি শুধু মুখ পুড়েছে কাল পুড়বে সর্বাঙ্গ।

ঘোষ আর গোস্বামী ঝগড়া করতে-করতে বেরিয়ে এল বারান্দায়, ঝগড়া করতে-করতে এগিয়ে গেল বাব-লাইব্রেরিব দিকে।

ঘোষ বলছে, 'দেখে নেব।'

গোস্বামী বলছে, 'শিখিয়ে দেব।'

'সিধে করে দেব।'

'জেলি বানিয়ে দেব।'

'জেলে দেব।'

'ঝুলিয়ে দেব।'

সবাই বললে, বার-লাইব্রেরিতে ঢুকেই হাতাহাতি শুরু করে দেবে, শেষ হবে গিয়ে রক্তারক্তিতে।

পরান-হারান বললে, বিপক্ষের সাক্ষী মায উকিল পর্যন্ত ধ্বংস হোক।

সবার পিছে পিছে পরান-হারানও গিয়েছে লাইব্রেরিতে। কিন্তু এ তারা দেখছে কী?

দেখেছে পাশাপাশি তুই চেয়ারে বসে প্রিয় ঘোষ আর প্রিয় গোস্বামী একটা সিগারেট টানছে। মানে, এ কটা টান মেরে ওকে দিচ্ছে, ও কটা টান মেরে একে দিচ্ছে। আর প্রচুর হাসছে তু'জনে। আর হাসির চোটে ওর চশমা নেমে আসছে কপালের থেকে, এর চশমা স্থির থাকছে না নাকের ডগায়। এ ওর পিঠ চাপড়াচ্ছে, ও একে ঝাঁকুনি দিচ্ছে হাত ধরে। তু' জনের গলায়-গলায় ভাব।

পরান-হারান. মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। উকিলে-উকিলে মিল হয়ে গেল এরি মধ্যে ? এত কিছুর শেষ এই ? এই হাসাহাসি ? তু'জনে মিলে একটি সিগারেট ভাগ করে খাওয়া ? পরান-হারান ঠিক দেখছে তো ? তাদের চোখে ঝাপসা ধরেনি তো ? সাক্ষীরা কী বলে ? ঠিকই বলে, ঐ তুই প্রিয়বাবু একই থালার থেকে তুলে এখন রসগোল্লা খাচ্ছে।

'কি, মিটে গেল আপনাদের ?' কে একজন প্রশ্ন করলে।

'না, মিটলে চলবে কেন ? আমরা তুজনেই যে প্রিয়।'

'তা ছাড়া পদবীতেও আপনাদের একটু মিল আছে।' কে আরেকজন টিপ্পনি কাটল : 'গরুর গন্ধ আছে তু'জায়গায়।'

উঠল তুমুল হাসি। পরান-হারান হতভম্ব।

পরস্পরের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, এ জগতের কোনো দিক-নিশানা খুঁজে পায় না।

তারা ঠিক করলে এমন উকিল তারা আর রাখবে না। কালকের জন্যে অন্য উকিল লাগাবে। মোকদ্দমার নেশাই যে এরা মাটি করে ফেলছে। রক্তের গরম দিচ্ছে কমিয়ে। বেশি করে ফি দেবে, আরো ভালো উকিল চাই, আরো বেশি রকম ঝগড়াটে।

মুহুরিরা বললে, 'এবার টাই-পরা উকিল দেব, শুনবে ইংরিজিতে ঝগড়া।'

পরান-হারান চাঙ্গা হয়ে বাড়ি চলল।

তাদের যেতে হবে নদী পার হয়ে, ক্রোশ তিনেক উজিয়ে গিয়ে। কারু সঙ্গে কারুর সম্পর্ক নেই। কে কোন নৌকোয় যাবে কেউ খোঁজও করে না। এ যদি যায় এ ঘাটে, ও ও-ঘাটে।

কিন্তু যাবে তারা এক গ্রামে। পাশাপাশি এলাকায়।

সন্ধ্যে হতে-না-হতেই নিদারুণ ঝড় উঠল। দোয়াতের পর দোয়াত উপুড় করে শূন্যতলে কে ঢালতে লাগল কালো কালি। কোথায় কার নৌকো, সব বানচাল ছত্রখান হয়ে গেল। যে নৌকোতে হারান যাচ্ছিল সেটাকে কাছি দিয়ে বাঁধা হল একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে। পরানের নৌকো কোথায় তলিয়ে গেল কে জানে।

ঝগড়ার পরে হাসির মতো ঝড়ের পরে জ্যোৎস্না উঠেছে। গাঁয়ের দিকে ভেসে চলেছে হারানের নৌকো। তার ভাগ্নে বৈঠা চালাচ্ছে আর মধ্যে বসে তামাক খাচ্ছে হারান।

'কে যায়?'

হাবান উত্তর করল না।

'বড় বিপদে পড়েছি, একটু তুলে নেবে আমাকে? যাব পীরের ডাঙায়।'

এ যে হারানেরই গ্রাম। কিন্তু ব্যাপার কী?

'ঝড়ে নৌকো লোপাট হয়ে গেছে। আমি সাঁতরাতে-সাঁতরাতে এখানে এসে উঠেছি।'

'মামা, এ পরান। আমাদের শত্রু।' ভাগ্নে গর্জে উঠল।

হারান বললে, 'জানি। গলার আওয়াজে আগেই চিনতে পেরেছি। উঠে এস বেয়াই।'

পরান কাঁপতে-কাঁপতে উঠে এল নৌকোয়।

হুঁকোটা তার হাতে দিয়ে হারান বললে, 'নাও, টানো। ওরা এক সিগারেট টানতে পারে আর আমরা এক হুঁকো থেকে খেতে পারব না?' বলে সে হেসে উঠল।

পরান তাকিয়ে রইল আশ্চর্য হয়ে।

পথে আগেই হারানের বাড়ি পড়ে। পরান বললে, 'তোমার সঙ্গে এখানেই আমি নেমে যাই। ওটুকু পথ আমি হেঁটেই চলে যেতে পারব।'

'তা কি হয়? একেবারে তোমাকে তোমার বাড়ির ঘাটেই পৌঁছে দিয়ে আসি।' হারান স্নিগ্ধ চোখে তাকাল পরানের দিকে: 'শুধু তোমাকেই তো পৌঁছে দিয়ে আসছি না, তোমার নৌকোও তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি যে। কি, চিনতে পাচ্ছ না নিজের নৌকো? কি করে চিনবে, সাজপাট সব বদলে ফেলেছি যে।'

পরান হারানের হাত চেপে ধরল।

হারান বললে, 'উকিলরা ভেবেছে ওরাই শুধু মেটাতে জানে। তা নয়, আমরাও মেটাতে পারি, আমরাও হাসতে পারি এক সঙ্গে।'

জলতরঙ্গের সঙ্গে ওদের মিলিত হাসি অন্ধকারে ধ্বনিত হতে লাগল।

শাসন

'এই লোকটা কে ?'

'লোক কোথায় ? ভদ্রলোক।'

'ভদ্রলোক তো জেলে কেন ?'

'তা ভদ্রলোকেবাও তো আসে মাঝে-মাঝে। অনেক সময় জেলটাও আখেরে কাজ দেয়। দেখতেই পাচ্ছ, দিয়ে এসেছে এ পর্যন্ত। সংসারে কিছুই ব্যর্থ হবার নয়।'

'কিন্তু এ এসেছে কোন অপবাধে ?'

'অপবাধ আবার কী! অপরাধ দুর্ভাগ্য। এ এসেছে দুর্ভাগ্যেব বলি হয়ে।'

'দুর্ভাগ্য ?'

'হ্যাঁ, শত্রুব ষড়যন্ত্র। বলতে পাবো, কূটকৌশল।'

'রাখো। সকলেই তাই প্লিড কবে। কিন্তু সেকশানটা কী ?'

'সেকশানটা খাবাপ।'

'খাবাপ মানে ? ফোব টুয়েনটি ?'

'না, থ্রি ফিফটি ফোব।'

'তার মানে, আউটরেজিং ফিমেল মডেস্টি ? কী ভীষণ কথা! ভদ্রলোকের এমন সম্ভ্রান্ত চেহারা, তাব এই মতিগতি ?'

'মতিগতির কথা যত কম বলা যায়! তা মুখে টর্চ ফেলেও তো আউটরেজিং হয়। গাড়িতে লিফট দিতে চাইলেও আউটরেজিং।'

'তা হলে কি জেল হয় ? বড় জোর জরিমানা।'

'জেল-জরিমানা তো ম্যাজিস্ট্রেটের খেয়াল।'

'কিন্তু এ তো কনভিকশানের বিরুদ্ধে আপিল করেছিল। আপিল তো ডিসমিস হয়ে গিয়েছে। শাস্তিরও তো রদ-বদল হয়নি।'

'তা হয়নি।'

'নিশ্চয়ই তা হলে কেসটা সাংঘাতিক।'

'সাংঘাতিক তো নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু আসলে কেসটা কী?'

জেল স্টাফের লোকেরা বলাবলি করছিল। কেসটা কী যদি জানতে হয় তো জাজমেণ্টটা পড়ো। জেল ছেড়ে কোর্টে চলো।

প্রসিকিউশানের প্রথম সাক্ষী স্বয়ং সাধনা সিং। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে যেন ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গী। যে চোখে চোখ ফেলবে তাকেই ছোবল মারবে এমনি তেজ।

সরকারী উকিল জিজ্ঞেস করল, 'আসামী পঙ্কজ ঘোষকে চেনেন?'

'চিনি। আমাদের বাড়িওলা।'

'উনি থাকেন কোথায়?'

'উপরে, দোতলায়। আমরা নিচে, গ্রাউণ্ড ফ্লোরে।'

'কত দিন আছেন ভাড়াটে?'

'বছরখানেক। আগের ভাড়াটেকে তুলে দিয়ে আমাদের বসান। আগের ভাড়ার চেয়ে পঞ্চাশ টাকা বেশি নিচ্ছেন আমাদের থেকে। এই ওর কাজ। কদিন পরে পুরোনো ভাড়াটে তুলে দিয়ে নতুন করে ভাড়া বাড়ানো। আগের ভাড়াটেকে তো মেরে তাড়িয়েছিল। এবার ভেবেছে—' কথায় টগবগ করছে সাধনা।

সরকারী উকিল তাকে সংযত করল। বললে, 'ওঁদের সঙ্গে আপনাদের ভাব কী রকম?'

'ওঁদের সঙ্গে মানে?' ঝঙ্কার দিয়ে উঠল সাধনা।

'মানে ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর?'

'ভীষণ খারাপ। সব সময়েই ঝগড়া, চেঁচামেচি—'

'আপনারাও চেঁচামেচি করেন?'

'তা করতে হয় বৈ কি। যখন জল বন্ধ করেন, আলোর লাইন কাটেন, উপর থেকে ময়লা ফেলেন—'

'সমস্ত অকীর্তিই আসামীব?'

'তাঁর স্ত্রীটিও কম যান না। দুজনেই এক গোয়ালেব গরু। সমান জাঁহাবাজ। দেখুন না কোর্টে পর্যন্ত এসেছেন—'

'কোর্টে তো আপনিও এসেছেন!' আসামী পক্ষেব উকিল টিপ্পনী ঝাড়ল।

'আমি তো এসেছি ফবিয়াদী হয়ে।' সাধনা সিং আবাব প্রখবদীপ্র হয়ে উঠল: 'আমি তো উৎপীড়িত। আমি না এলে অন্যাযেব শাসন হবে কী কবে? কিন্তু উনি—উনি এসেছেন কোন সুবাদে? ওঁব বিরুদ্ধে তো আমাব অভিযোগ নয়।'

'উনি এসেছেন স্বামীব সাফাই হয়ে।' ডিফেন্সেব উকিল বললে গম্ভীরমুখে।

প্রথম থেকেই অঞ্জলি ঘোষের দিকে সকলেব নজব পড়েছিল। লাবণ্যেব বিষণ্ণ আভায় চাবদিক শুচিস্মিত কবে বসেছে। এমনটি যেন কেউ এ পবিবেশে প্রত্যাশা কবে না। শান্ত মুখশ্রীটুকু এমন সত্যে ও সবলতায় ভবা যে একবাব চোখ ফেলেই দেখা শেষ কবে দেওয়া যায় না।

'এব আবার সাফাই কী?' ঝলসে উঠল সাধনা।

'সে আমবা বুঝব।' পঙ্কজ ঘোষেব উকিল গম্ভীবতব হল।

'সে সব পবেব কথা পবে।' সবকাবী উকিল তাকাল সাধনার দিকে: 'এখন ঘটনাব দিন কী হয়েছে তাই বলুন। হ্যাঁ, তাব আগে একটা কথা। বাড়িভাড়া দিতেন কী কবে? মনি-অর্ডাবে?'

'না। আমার স্বামী গিয়ে দিয়ে আসতেন বাড়িওলাকে। কখনো কখনো এক-আধ দিন দেবি হলে বাড়িওলা নিজেই এসে নিয়ে যেত।'

'তা হলে দরকার হলে আসামী আসতেন আপনাদের ফ্ল্যাটে।'

'অদরকারেও আসতেন। ওঁর চিৎকার, সর্বক্ষণ শাসানো। এই দেয়ালে পেরেক ঠুকছি, শব্দ করে কয়লা ভাঙছি, ধোঁয়া যাচ্ছে উপরে, জলের কল বন্ধ করে রাখছি না—নিত্যি নালিশ, নিত্যি নালিশ—আর, সব সময়ে, তা নেপথ্য থেকে নয়, একেবারে মুখোমুখি উপস্থিত হয়ে—

'হ্যাঁ, এইবার ঘটনার দিন—' সরকারী উকিল ধরিয়ে দিল।

'ঘটনার দিন সন্ধ্যের সময় বাইরের ঘরে টেবিল গোছাচ্ছিলাম, দরজাটা খোলা ছিল, পর্দা ঝুলছিল, হঠাৎ জুতোর শব্দে তাকিয়ে দেখি আসামী ঘরে ঢুকেছে। ভাবলাম ভাড়া চাইতে এসেছে বুঝি। বললাম, আমার স্বামী এখনো আফিস থেকে ফেরেননি, উনি ফিরলে পরে আসবেন, নয়তো কাল সকালে—'

'আসামী কী বলল?'

'কিছু বলল না। হঠাৎ আমার গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।'

'ঝাঁপিয়ে পড়ল মানে?' আইনের চোখে সমস্ত দৃশ্যটা স্পষ্ট করা দরকার, তাই সরকারী উকিল বিশদ হতে চাইল।

'আমাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরল। আর—'

'বলুন খোলাখুলি।' সরকারী উকিল আশ্বাস দিল: 'এতে কোনো লজ্জা নেই। সত্যের কাছে আইনের কাছে কিছুই গোপনীয় নয়, অশ্লীল নয়।'

'আর, আমার মুখের কাছে মুখ এনে—' সাধনা চোখ বুজল।

'আর—' সরকারী উকিল চাইল তপ্ত করতে।

'আর তখুনি আমি চিৎকার করে উঠলাম। চোর-চোর করে উঠলাম। আর ভগবানের এমনি দয়া, ঠিক সেই সময়ে আমার স্বামী এসে পড়লেন, রেডহ্যাণ্ডেড ধরে ফেললেন আসামীকে।'

'তারপর?'

'আমার স্বামীর চিৎকারে পাড়ার লোকজন জমায়েত হল। আসামী পালাবার পথ পেল না।'

যথারীতি আসামীর উকিল উঠল জেরা করতে।

'দরজা খোলা ছিল বলছেন? আমি বলছি, আই পুট ইট টু ইউ, দরজা বন্ধ ছিল।'

'দরজা বন্ধ ছিল?' কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপের ঝাঁজ আনল সাধনা: 'দরজা বন্ধ থাকলে লোকটা ঢোকে কী করে?'

'আপনি যদি খুলে দেন।'

'আমি খুলে দেব?' ভুজঙ্গী আবার ফণা তুলল: 'কিছুর মধ্যে কিছু না, দরজা খুলে দেব আমি?'

'ধরুন, উনি নক্ করলেন, আপনি ভাবলেন আপনার স্বামী এসেছেন, দরজা খুলে দিলেন।'

'আমার স্বামী অমনি নক্ করে আসেন না।' বিষিয়ে উঠল সাধনা।

'স্যার,' সরকারী উকিল হাকিমকে লক্ষ্য করল: 'আমাদের ক্রিমিন্যাল ট্রেসপাসের কেস নয়। যে ভাবেই ঢুকুন আসামীর এনট্রিটা বেআইনি নয়। আমাদের কেস হচ্ছে লিগ্যাল এনট্রির পর আসামী দুর্ব্যবহার করেছে। আসামী যে ঘরে ঢুকেছিল এ তো ডিফেন্সের স্বীকার। ডিফেন্স বলতে চাচ্ছে আসামী নির্দোষ—ভাড়া আদায় করতে গিয়েছিল। আউটরেজের কেসটা বানানো।'

'আমাকে জেরা করতে দিন।' আসামীর উকিল হুমকে উঠল: 'প্রসিকিউশানকে দিন স্ম্যাশ করতে। স্বীকার-অস্বীকার বুঝি না, আমি দেখাতে চাই প্রসিকিউশান কেস অবিশ্বাস্য, ভিত্তিহীন, আগাগোড়া মিথ্যে।' বলে সাধনার দিকে তাকাল বাঁকা চোখে। বললে, 'বেশ, দরজা খোলা ছিল—'

'ছিলই তো।' আবার ঝাপটা মারল সাধনা: 'সন্ধ্যে হতে না হতেই কে বন্ধ করে দরজা? তা ছাড়া স্বামী তখনো ফেরেননি আপিস থেকে।'

'শুধু দরজা নয়, জানলাও খোলা ছিল?'

'ছিল বৈ কি। আমরা কি অন্ধকূপের জীব যে দরজা-জানলা সব বন্ধ করে থাকব?'

'আর সে জানলা রাস্তার দিকের জানলা?'

'জানলা তো রাস্তার দিকেই থাকে।' সাধনা আবার দীপ্ত হয়ে উঠল: 'আর, ভাগ্যিস খোলা ছিল। খোলা ছিল বলেই তো ডাকতে পারলাম সকলকে। আমার চিৎকারটা পৌছুল ঠিকমত।'

'আপনার স্বামী বুঝি ঐ সময়েই ফেরেন?'

'বলতে চান ফেরেননি?' আবার টং করে উঠল সাধনা: 'ফেরেননি তো কালপ্রিট্‌কে হাতেনাতে ধরলেন কী করে?'

'আমার সে-প্রশ্ন নয়।' উকিল বললে, 'সেদিন ফিরেছিলেন কি না-ফিরেছিলেন তা জানতে চাইনি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনার স্বামী সাধারণত কখন ফেরেন?'

'শুনুন প্রশ্ন!' সাধনা তাকাল জনতার দিকে: 'ফেরার কি কখনো ঘড়িঘণ্টা আছে? এ কি ট্রেন যে য়্যারাইভ্যাল-এর ফিক্‌স্‌ড টাইম থাকবে?'

'আমি ঘড়িঘণ্টা জানতে চাইনি।' উকিলও নাছোড়বান্দা। 'আমি জিজ্ঞেস করেছি সাধারণত ফেরেন কখন?'

'যদি কাজকর্ম কম থাকে, রাস্তায় জ্যাম না হয়, আগে আগে ফেরেন; আর যদি কাজকর্ম বেশি থাকে, কিংবা রাস্তায় জ্যাম হয়ে যায়, তা হলে দেরি হয় ফিরতে।' ব্যঙ্গের হাসি হাসল সাধনা: 'এ তো সোজা কথা।'

'হ্যাঁ, সোজা কথা। সোজা কথাটা আমি আরো একটু সরল করে বলি।' উকিল স্বর দৃঢ় করল: 'আপনার স্বামী রোজ ঐ ঠিক একই সময়ে ফেরেন—বড়জোর দু-চার মিনিটের এ-দিক আর ও-দিক—আর, তা পঙ্কজবাবুর জানা।'

'আমার স্বামী কখন ফেরেন না ফেরেন তা উনি কী করে জানবেন?' সাধনা ফোঁস করে উঠল: 'উনি কি স্পাই?'

'না, স্পাই হবেন কেন?' উকিল দৃঢ়তর স্বরে বললে, 'যখন একই বাড়িতে আছেন তখন তাঁর পক্ষে আপনার স্বামীর বাড়িফেরার টাইমটা জানা খুবই সম্ভব।'

'তাতে কী হল?'

'তাতে, আসামীর পক্ষে ঐ সাংঘাতিক মুহূর্তে আপনাকে উদ্দাম আক্রমণ করাটা একেবারেই অবাস্তব কথা। স্রেফ গাঁজাখুরি।

'আপনি বললেই হবে?'

'আমি বললে হবে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বললে হবে।'

'আর চাক্ষুষ সাক্ষী যারা দেখেছে? আমার স্বামী, পাড়া-প্রতিবেশী?'

'খোলা দরজা-জানলা দিয়ে যারা দেখেছে?' এতক্ষণে উকিল হাসল: 'দরজা-জানলা খোলা রেখে কেউ হামলা করবে এও এক আষাঢ়ে গল্প।'

'তবে একটি-একটি করে দরজা-জানলা বন্ধ করে নেবে?' ডান হাতটা মুঠ করল সাধনা: 'আপনার মক্কেলের কেন সেই সুবুদ্ধি হল না? তা হলে সময় পেতাম। টেবলের উপর থেকে ভারী পেপার-ওয়েটটা কুড়িয়ে নিয়ে ওর মাথায় ছুঁড়তে পারতাম। বেঁচে যেতাম অপমান থেকে।'

'বেশ, এখন বলুন,' উকিল অন্য দিকে মোচড় দিল: 'আপনাকে যে আসামী আক্রমণ করল, তা কোন দিক থেকে? পেছন থেকে, না, সামনে থেকে?'

'এ আবার কী প্রশ্ন?'

'প্রশ্ন যাই হোক, উত্তর দিন।'

'কেন, দিক বুঝে কি অপরাধের গুরুত্ব বিচার হবে?' আবার ঝলস দিল সাধনা।

'তর্ক করবেন না। উত্তর দিন। দিক ঠিক হলেই আমি দেখাব সমস্ত গল্পটা ভুয়ো, অসার।'

'মানে,' ভীষণ কঠিন ঠাঁই সাক্ষীর কাঠগড়া, সাধনাকেও ঢোঁক গিলতে হল : 'মানে, আমি দরজার দিকে পিছন ফিরে কাজ করছিলাম, হঠাৎ পায়ের শব্দে তাকালাম ঘাড় বেঁকিয়ে। আমাকে প্রস্তুত হবার সময় না দিয়েই একটা ভাল্লুকের মতো আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুতরাং বলতে পারেন, খানিকটা বা সামনে থেকে আক্রমণ। পজিশানটা প্রায় এইরকম—' ছবিটা ভঙ্গি দিয়ে স্ফুট করতে চাইল।

'দরকার নেই। বুঝে নিয়েছি। খানিক সামনে খানিক পিছনে। শুনুন,' ব্যঙ্গে ধারালো হয়ে উঠল উকিল : 'আপনি এমন কিছু স্বর্গের অপ্সরী নন যে একজন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ ভদ্রলোক আপনাকে দেখেই মূর্ছা যাবে।'

'আপনিও এমন কিছু লেখাপড়াজানা লোক নন যে আপনাকে দেখেই বুদ্ধিমান মক্কেল আকৃষ্ট হবে।' পালটা চাবুক হানল সাধনা : 'আপনি যদি উকিল বলে কাটতে পারেন আমিও সুন্দরী বলে কাটতে পারব।'

কোর্ট সুদ্ধু সকলে হেসে উঠল।

'শুনুন।' মেঘনির্ঘোষে বললে এবার উকিল, 'আপনার সমস্ত কেস মিথ্যে। পাড়ার কতগুলো গুণ্ডাজাতীয় সাক্ষী হাত করে আসামীকে ব্লেকমেল করবার চেষ্টা। যাতে আগের ভাড়াটা বাহাল হয়। যদি আপনাদের সমস্ত উপদ্রব সমস্ত অপকর্ম উনি মেনে নেন ঘাড় পেতে।'

'না। সত্য কেস।' সাধনা স্থিরস্বরে বললে, 'অক্ষরে অক্ষরে সত্য।'

'আমি আবার বলছি আপনাকে অপমান করার আসামীর কোনো মোটিভ নেই।'

'মোটিভ আমাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া। যাতে বেশি ভাড়ায় নতুন লোক ফের আমদানি করা যায়। এই তো ওর কাজ, ওর ব্যবসা—'

একের পর এক সাক্ষী এল। স্বামী। পাড়ার বাসিন্দে। রাস্তাব লোক। কেউ প্রত্যক্ষদর্শী, কেউ বা ঘটনার অব্যবহিত পরে এসে শুনেছে।

একের পর এক জেরা হল।

আসামী কী বলছে? বলছে, সে নির্দোষ। সমস্ত কেস তঞ্চকী।

আসামীর পক্ষে সাফাই সাক্ষী দেবে নাকি?

দেব। উঠুন।

অঞ্জলি উঠল কাঠগড়ায়। আবতিব প্রতিমার মতো আলো করে দাঁড়াল।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে বইল চুপচাপ।

কী খেয়াল হল, উকিল বললে, দেব না সাফাই। এমন বাজলক্ষ্মীর মতো প্রতিমা যাব বাড়িতে তাকে তার স্বামীর স্বপক্ষে মুখ ফুটে কিছু বলতে হবে না। তাব উপস্থিতিটুকুই যথেষ্ট।

তারপর চলল আর্গুমেন্ট। প্রসিকিউশান যত বলে কেস আদ্যোপান্ত প্রমাণিত, ডিফেন্স তত বলে আদ্যোপান্ত মিথ্যে, বিশ্বাসের অযোগ্য।

ম্যাজিস্ট্রেটের কী খেয়াল হল, পঙ্কজ ঘোষকে দোষী সাব্যস্ত করলে। আগে কোন এক ভাড়াটেকে মাবপিট করবার জন্যে জরিমানা হয়েছিল, পুলিস এনে দেখাল পুরোনো বেকর্ড। অতএব এবার আর জরিমানা নয়। এবাব জেল।

চারটিখানি কথা নয়। চাব মাস জেল। সশ্রম।

একেই বলে আইনের খামখেয়াল।

আইনকে দোষ দিয়ে লাভ কী। বলো অদৃষ্টের ফের। ভগবানের মার। নিরীহ সাধুলোকেরও নিস্তার নেই।

কী শ্রম দিচ্ছে রে কয়েদী? কোথায় আছে?

ছাপাখানায়। কম্পোজিটারি করছে। কাজ কমিয়ে দিচ্ছেন

সাহেব। ভদ্রলোক ধর্মভীরু। প্রায় সারাক্ষণই মৌনে থাকে, জপধ্যান করে। কোনো অসন্তোষ নেই। জিজ্ঞেস করলে বলে, তপস্যা করছি। আকাঙ্ক্ষিত ফল তপস্যা ছাড়া লভ্য নয়।

বলে, স্ত্রী-শক্তি, সতীশক্তিই তাকে রক্ষা করছে। স্ত্রীর সঙ্গে একসক্লুসিভ ইনটারভিয়ু পাবার জন্যে দরখাস্ত করেছিল। মঞ্জুর হয়েছে দরখাস্ত।'

জেলে যে সদাচারী তারই জন্যে তো এই পবিত্র ব্যবস্থা। একটু সন্নিহিত হয়ে স্ত্রীর সঙ্গে নির্জনে-নিবিড়ে যৎকিঞ্চিৎ হৃদয়ের বিনিময়।

জেল বলে সেটা তো একটা নির্মম কবন্ধ নয়। মানবিক মমতাকে বাদ দিয়ে শাসন চলে না। শোধন চলে না। পাষাণ যে পাষাণ তারও বুক চিরে জল আসে।

নির্ধারিত দিনে একক ঘরে অপেক্ষা করছে পঙ্কজ।

গা মাথা চাদরে ঢাকা, ধীর পায়ে সাধনা সিং ঘরে ঢুকল। চেয়ার টেনে পঙ্কজের কাছে এসে বসল। বলল, 'ঠিকানাটা তো এক। তাই পেরেছি ম্যানেজ করতে। কিন্তু, কতক্ষণ,' দরজার দিকে তাকাল ব্যাকুল হয়েঃ 'কতক্ষণের ইনটারভিয়ু ?'

ইনচার্জ অফিসর এসে বললে, 'একসক্লুসিভ পনেরো মিনিট।'

'পনেরো মিনিট ? পনেরো মিনিট কী হবে ?' দু চোখে করুণ মিনতি আনল সাধনাঃ 'অনেক কথা আছে যে।'

'আচ্ছা, নিন, আধঘণ্টা।' চলে যেতে-যেতে ইনচার্জ বললে, 'নিশ্চিন্তে আলাপ করুন। কেউ আসবে না, ডিসটার্ব করবে না। শুধু দরজাটা খোলা থাকবে। সেপাইসান্ত্রী গার্ড দেবে বাইরে। নিন, ফ্যামিলি ম্যাটার্স কী আছে সেরে নিন।' বেরিয়ে গেল ইনচার্জ।

ব্যস্ত চোখে ঘরের চারদিকে তাকাল সাধনা। হ্যাঁ, থাক দরজা খোলা, জানলাটা তো বন্ধ আছে। জানলাটাই পাজি। জানলাটা বন্ধ থাকলেই হল।

জ্যাম

লোকটা ঘোড়া চেয়েছিল। ক্লান্ত হয়ে গাছের তলায় বসে দু হাত তুলে, রামজী, একঠো ঘোড়া দে, একঠো ঘোড়া দে, বলে কেঁদেছিল। প্রার্থনায় কোনো ত্রুটি ছিল, থাকা সম্ভব, ভাবতেও পারেনি। পায়ের মধ্যে নয়, হাতের মধ্যে ঘোড়া পেল লোকটা। চড়তে পেল্ না, বয়ে নিয়ে চলল। ঘোড়াই চেয়েছ, চড়তে তো আর চাও নি। সওয়ার না হয়ে কুলি হও।

লোকটা গাড়ি চেয়েছিল। প্রেস্টিজের ঠেলায়ই হয়েছিল চাইতে। রামজী জুটিয়ে দিয়েছে গাড়ি। কিন্তু গাড়িই চেয়েছ, চলতে তো আর চাও নি। সুতরাং গাড়ির মধ্যে বসে থাকো।

ঘোড়ার জন্যে লাগাম-চাবুক নেই ; গাড়ির জন্যে—কলে-কব্জায় নিটুট-নিখুত গাড়ি, মবিলে-পেট্রলে সড়গড়—আসল জিনিস, রাস্তাই নেই।

হাওড়া ময়দান থেকে শেয়ালদা পর্যন্ত জ্যাম।

মঙ্গল ঘুরপথে বাড়ি যেত। সে কি, শর্টকাট করো না কেন? শর্টকাটে আপত্তি কী!

'বলছ যতীন দাস রোড দিয়ে যাব? সর্বনাশ। সোনামামা যে ঐ রাস্তায় থাকে।'

'তা—ভালোই তো।'

'সোনামামা লজঝড় এক গাড়ি কিনেছে। দেখা হলে রক্ষে নেই, বলবে, মঙ্গল, হাত লাগা। গাড়ি ঠ্যাল। গাড়ি ঠেলার ভয়ে যাইনে ও-পথ দিয়ে।'

যখন ও-পথ দিয়ে প্রথম গেল মঙ্গল, তখন নিজে সে নতুন গাড়ি কিনেছে। সে নিজেই গাড়ির চালক-পালক।

দেখলাম জ্যামের মধ্যে মঙ্গলের গাড়ি। হুইলে মঙ্গল বসে। আর কেউ ছিল কিনা গাড়িতে জানি না। থাকলেও নেমে পড়েছে। কেটে পড়েছে। বেলা প্রায় তুটো থেকে জ্যাম।

অন্তত আমি তো নেমে পড়েছি।

হাওড়ায় সভা করতে গিয়েছিলাম। শীতের দিন তিনটে থেকে সভা। তুটোর আগেই বেরিয়েছিলাম, জ্যাম তখনো লাগেনি পুরোপুরি। সভাশেষে ফিরছি পাঁচটায়। হাজার হাজার গাড়ির গাদি লেগেছে। ট্র্যাম, বাস, স্টেটবাস, ফিটন, গরুর গাড়ি, মোষের গাড়ি, ঠেলা সাইকেল-রিকশা, টানা-রিকশা—আগা-পাশ-তলা ছয়লাপ। সামনে-পিছনে, এ-পাশে ও-পাশে, উত্তরে দক্ষিণে, বাইরে ভিতরে—এবেদং সর্বমিতি। সর্বং খল্বিদং রথং। একটাকে কাটাতে গিয়ে আরেকটার মুখোমুখি এসে পড়ছে। ব্যাক করতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বাঁকা হয়ে। সর্বত্র ঠেসাঠেসি ঘেঁষাঘেঁষি গাদাগাদি লাগালাগি—তালগোল পাকানো অখণ্ড তাণ্ডব।

'আপনার গাড়ি করেই তো যাবেন—' বলেছিল সভার উদ্যোক্তারা।

'মোটেই না। আপনারাই বহন করবেন যোগক্ষেম। তাছাড়া আমার গাড়ি কই?'

'ঠিক আছে। আমরাই এসে নিয়ে যাব। পৌঁছে দেব আবার।'

কিছুই ঠিক নেই। কেন্দ্র ঠিক নেই, সীমানা এলাকা ঠিক নেই। দণ্ড যাই থাক, মেরুদণ্ড ঠিক নেই। কাণ্ডটাই শুধু আছে, কাণ্ডজ্ঞান দেশান্তরী।

'আপনার উপায় কী হবে?' আমার সঙ্গের লোক, সভাব লোক, আমার মুখের দিকে তাকাল।

'পায়ে হেঁটে চলে যাচ্ছি। বঙ্গে যখন আছি তখন কপালও সঙ্গেই থাকবে।'

নির্বন্ধন চললাম পদব্রজে। যত এগোই দশদিকে কেবল গাড়ি আর গাড়ি। পাহাড় আর পাহাড়। অচল আর অনড়ের স্তূপ।

ট্র্যাম-বাসের যাত্রীরা নেমে পড়েছে। কণ্ডাক্টররা জমায়েত হয়ে গুলতানি করছে। কিন্তু ড্রাইভারদের জায়গা ছাড়বার উপায় নেই। কখন দরজা খোলসা পায় তারই জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে। তবু ওদের লঘু মন, যেহেতু চলা-বসা ওদের সমান। দু'অবস্থাতেই ওদের সমান ডিউটি। হয়তো বা ওভারটাইম। তাই কেউ বা বিড়ি-সিগারেট ফুঁকছে, কেউ বা খইনি টিপছে তন্ময় হয়ে।

কিন্তু প্রাইভেট? তাকানো যায় না আরোহী বা চালক-পালকের দিকে। প্রথমে ভেবেছিলাম অনুকম্পার বস্তু, কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখলাম মর্মান্তিক কষ্টের।

যন্ত্রের শব্দটাই শুধু নয় স্তব্ধতাটাও এক হৃদয়ভেদী হাহাকার।

মঙ্গলকে আমি কী ভাবে সাহায্য করতে পারতাম? ব্যাটারি ডাউন হয়ে যাবার পর ও ওব প্রেস্টিজকে যখন ঠেলবে তখন পারতাম হাত মেলাতে। কিন্তু ঠেলবার জন্যেই বা জায়গা পাব কতক্ষণে?

পা চালিয়ে চালিয়ে পালিয়ে এলাম।

কে ভেবেছিল হাওড়া জজকোর্ট থেকে কলকাতা স্মলকজ কোর্ট পর্যন্ত পায়ে হাঁটব! পায়ে হেঁটে পেরোব হাওড়ার পোল! খালি পায়ে দাঁড়াব গঙ্গাব উপরে!

বুঝতেই পাচ্ছেন সভাস্থলে জুতোজোড়া খোয়া গিয়েছে।

স্ট্র্যাণ্ড রোডের মুখে এসে দেখলাম অজগরে স্পন্দন এসেছে। কাছেই একটা চলতি ট্র্যাম পেয়ে উঠে পড়লাম লাফিয়ে।

দেখি যাত্রীছুট ফাঁকা কামরাটাতে এক কোণে বসে আছেন আমাদের সেই মফস্বলের অনাদি-দা। এমনভাবে র‍্যাপার মুড়ি দিয়েছেন যে, রাত্রে হোক প্রভাতে হোক, গাড়ি চললেই তিনি চলবেন, নচেৎ নয়। ভাড়া যখন একবার দিয়েছেন তখন আর

ছাড়বেন না। আমার আর সময়ের দাম কী? আমার আবার ভাড়া কিসের? তাঁর ভাবখানা যেন এই রকম।

পাশে বসলাম। চিনতে পারলেন। শুধোলেন, 'কী হয়েছ?'

'কী হয়েছ মানে?' অবাক হলাম প্রশ্নে।

'স্বাধীন হও নি?'

'সে তো কবেই হয়েছি।'

'আহাহা, সেকথা কে জিজ্ঞেস করছে? বলছি হালের কথা। হালে রিটায়ার করনি?'

'না করে করি কী!'

'তাই তো বলছি স্বাধীন হয়েছ। স্বাধীন না হলে কি কারু সাধ্যি আছে খালি পায়ে হাঁটে, সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে চড়ে?' দাদা পিঠ চাপড়ালেন।

একটুখানি গিয়েই ট্রাম থেমে পড়ল। আবার জ্যাম।

নেমে পড়লাম। হাঁটতে-হাঁটতে ড্যালহৌসী।

তারপর বাড়ি।

কয়লার ধোঁয়ায় রাতের কলকাতা রুদ্ধশ্বাস অন্ধকূপ ছাড়া কিছু নয়। তবু অনায়াসেই এক নক্ষত্রস্পন্দিত উজ্জ্বল আকাশ কল্পনা করতে পারছি। কোটি কোটি জ্যোতিষ্ক চলেছে ডাইনে বাঁয়ে উজানে-ভাঁটিতে।

কখনো জ্যাম হচ্ছে না।

দু' মিনিট

কোনো চালু উকিল বা হাকিম মারা গেলে ফুল-কোর্ট রেফারেন্স হয়। আর ভাষণান্তে আসন ছেড়ে দাঁড়াতে হয় এক মিনিট।

মৃত ব্যক্তি শাঁসালো হলে দু' মিনিট।

শুধু কোর্টে নয়, যে কোনো সম্ভ্রান্ত শোকসভায়। এবার তবে মৃত আত্মার সম্মানার্থ দু' মিনিট নীরবতা পালন করি সকলে। দণ্ডায়মান হই।

'কাল রাতে সদাসত্যবাবু মারা গেছেন—' বার-এ যিনি দুর্বার, জজসাহেবের খাসকামরায় এসে বিঘোষিত হলেন।

'বলেন কী!' শোকার্ত মুখ করলেন জজসাহেব। 'কিছু জানি না তো—'

'কেন, খবরেব কাগজে তো বেবিয়েছে।'

'খবরের কাগজ পড়বাব সময় কই? শুধু হেডলাইন কটায় চোখ বুলুই।'

'একটা ফুল-কোর্ট বেফারেন্স করতে হয়।'

'নিশ্চয়ই। একশোবাব।'

দ্রুত নোট নিতে লাগলেন জজসাহেব। জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো বলুন। কোন সালেব গ্র্যাজুয়েট। কতদিনকাব প্র্যাকটিস। প্র্যাকটিস শুরু কববার আগে কী করতেন। সংগ্রাম করে করে কী রকম উঠেছেন নিচে থেকে। ছেলে ক'জন? তাদের কে কেমন কৃতবিদ্য?

'অন্যান্য গুণপনা?'

'সে তো মুখস্থই আছে। সে তো সমস্ত আত্মা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কর্মনিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ, অধ্যবসায়ী, ধার্মিক, সদাশয়, দানশীল, সৌজন্যের প্রতিমূর্তি। তাতে কোনো ত্রুটি হবে না।'

কোর্টে-কোর্টে নোটিশ চলে গেল। নির্দিষ্ট সময়ে সকলে এসে জমায়েত হোন।

কোর্ট গুনে-গুনে চেয়ার পড়ল এজলাসে। যদি স্থান সংকুলান না হয়, নিচের দিকের অতিরিক্তরা বসবে উকিলদের সঙ্গে।

আগে স্থান পরে শোভা। আগে শোভা পরে শোক।

আর্দালিদের সাহায্যে সাজসজ্জা সেরে হাকিমেরা বসেছেন উঁচুতে। সমতলে উকিল। দেয়ালে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতি।

উকিলদের মধ্যে থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলেন।

স্যুটেবল রিপ্লাই দিলেন জজসাহেব। উকিলের বেলায় দাঁড়িয়ে, হাকিমের বেলায় বসে। সমস্ত ব্যাপারটা আদালতী বলে পদ্ধতিটাও তদ্রূপ। উকিল যেন আর্গুমেন্ট করছেন, হাকিম যেন রায় দিচ্ছেন। আর সেই কারণে ভাষাটাও ইংরিজি।

গীতা-উপনিষৎ তাই কিছুই কোট করা গেল না।

এবার তবে মৃত আত্মার সম্মানার্থ দু' মিনিট উঠে দাঁড়ান।

চেয়ার ইত্যাদি সবানোর প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে উঠে দাঁড়াল সকলে।

মহাত্মা শুধু ছবিতেই। তাঁর কথা কে মনে রাখে?

তিনি বলেছিলেন, এভাবে উঠে দাঁড়ানোটা ভাবতীয় ভঙ্গি নয়। উপাসনার ভঙ্গিই ভাবতীয় ভঙ্গি। যাব যাব আসনে স্থির হয়ে স্তব্ধ হয়ে ভক্তিনম্র হয়ে বসে থাকো।

দু' মিনিট!

কতক্ষণে কাটবে এই ঘোর দুঃসময়? কে বলে দেবে এতক্ষণে দু' মিনিট হল? কে তাকাবে ঘড়ির দিকে? কে শুনবে সেকেণ্ডের শব্দ? ঘড়ির দিকে তাকানো কি ঠিক হবে? কারু মুখের দিকে তাকানোও ঠিক হবে না। মৃতের প্রতি অসম্মান হবে। পারো তো চোখ বুজে থাকো। হৃৎপিণ্ডের শব্দ শোনো।

রমেশবাবুর মনে পড়ল বদলির সময় একবার এক রেলওয়ে

স্টেশনে ট্রেন থামার সময় ছিল দু' মিনিট। কত দুশ্চিন্তায় ছিলেন ঐটুকু সময়ের মধ্যে বিরাট লটবহর নিয়ে নামতে পারবেন কিনা। শেষে দেখলেন, এত সময়, দাড়ি কামিয়েও নেওয়া যেত। পরেশ-বাবুর মনে হল, আগে যখন বগল-চাপা পাঁচ মিনিটের থার্মোমিটার ছিল, তখনও যেন অত্যাচার এত দীর্ঘ ছিল না। দীনেশবাবুর মনে হল, চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে না ঘুমিয়ে পড়ি, নাক না ডেকে ওঠে। আর, সুরেশবাবু ভাবলেন, হয়তো আস্তে-আস্তে ঘর খালি হয়ে যাবে আর তিনি নতমাথায় দাঁড়িয়ে থাকবেন অনন্তকাল, তাঁর দু' মিনিট আর কাটবে না।

আমলাদের ভিতর থেকে কে একজন বলে উঠল, দু' মিনিট হয়ে গেছে।

তাদের তো শোকের দায়িত্ব নেই। তারা ঘড়িই দেখছে গোড়াগুড়ি।

আর বসা নয়, চেয়ার ঠেলতে-ঠেলতে বেরিয়ে পড়ো।

'অনেকদিন কারু সঙ্গে দেখা নেই।' ভবেশবাবুকে বললেন শৈলেশবাবু।

'দেখা না হওয়াই ভালো।' বললেন ভবেশবাবু। 'দু' মিনিটের দেখা। দেখা হওয়া মানেই তো কারু টেঁসে যাওয়া।'

পোস্টার

'ঠাণ্ডা আসছে। জানলাটা বন্ধ করে দাও।'

'বন্ধ করা যাচ্ছে না।'

'বন্ধ করা যাচ্ছে না মানে?' শিবেশ্বর বিরক্তিতে গর্জে উঠল: 'কেন, কী হল?'

'ওরা জানলার শিকে দড়ি বেঁধে দিয়ে গেছে।' ভয়ে ভয়ে বললে সুরমা।

'ওরা কারা?' ঝলসে উঠল শিবেশ্বর।

'ঐ যারা এখন কেন্দ্রে কেন্দ্রে ঝুলছে অলিতে-গলিতে।'

'তা ওদের তো আমাদের জানলা ধরে ঝোলবার কথা নয়।' লেপের নিচে ঢুকে পড়েছিল বলেই শিবেশ্বর আর উঠতে চাইল না। বললে 'রাস্তার গ্যাস পোস্টগুলি তো এখনো আছে।'

'তা আছে, কিন্তু অকেজো অবস্থায় আছে।' জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল সুরমা।

'কিন্তু ঝোলবার পক্ষে যথেষ্ট কেজো ছিল।' শিবেশ্বর কুঁকড়ি-সুকড়ি হয়ে বললে, 'কে না জানি বলেছিল ঝোলাবার পক্ষে গ্যাসপোস্টই প্রশস্ত।'

'ওখানে হলে নিচু হ'ত—'

'মানে সম্ভ্রমে খাটো হত বলতে চাও, তাই দোতলায় উঠে একেবারে আমাদের জানলা ধরেছে! অসম্ভব!' লেপের তলা থেকে মুখ বার করতে চাইল শিবেশ্বর: 'তুমি দড়ির গিঁটটা খুলে দাও।'

'ভীষণ আঁট।'

'পরের শান্তিতে হাত দিয়েছে, আঁট তো হবেই।' শিবেশ্বর আরো গুটিয়ে গেল: 'গিঁট খুলতে না পারো, কেটে ফেল ছুরি দিয়ে।'

'ওরে বাবা!' অন্ধকারে যেন ভূত দেখল সুরমা।

'কেন এত ভয় কিসের?' প্রচণ্ড শীত না হলে এখুনি প্রায় তড়াক করে লাফিয়ে উঠত শিবেশ্বর।

'তোমার কী! তুমি তো দিব্যি আপিসে চলে যাবে, তারপর ভলান্টিয়ররা বাড়ি চড়াও হয়ে হামলা করুক আমার উপর। হাঙ্গামায় কাজ নেই, জানলায় বরং একটা চট টাঙিয়ে দিই।'

কিন্তু সকালে উঠে বাড়ির বাইরে এসেই শিবেশ্বরের চক্ষুস্থির। বাড়ির রাস্তার দিকের দেয়ালে কারা সব চিত্র-বিচিত্র ইস্তাহার সেঁটে দিয়েছে।

'কী অপরাধ করেছিলাম!' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল শিবেশ্বর।

সুরমাকেও নিয়ে এসে দেখাল।

'কী সর্বনাশ! এই সেদিন নতুন রঙ করা হল বাড়িটার!'

তা কে কার কথা শোনে!

'নিরীহ গৃহস্থের উপর এই উৎপাত, এব কোন প্রতিকার নেই?' সুরমা তড়পাতে লাগল। 'জানলার চটে প্রত্যক্ষ কোনো হয়তো ক্ষতি নেই, কিন্তু এতে দেয়ালটা যে একেবাবে মাটি হয়ে গেল—'

স্তব্ধেব মতো তাকিয়ে রইল শিবেশ্বর।

'এর কোনো বিচাব নেই? থানা-পুলিস নেই?'

শিবেশ্বর তবুও নির্বাক।

'কারা না শুনেছিলাম পোস্টারেব বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছিল?' সুরমা ঝলসাতে লাগল। 'তারা এখন কোথায়? তারা এতে কী বলে?'

'তারা এসব দেখে না।' এতক্ষণে মুখ খুলল শিবেশ্বর।

'তবে তারা কী দেখে?'

'সুন্দর সুন্দর অশ্লীল সিনেমা-পোস্টার দেখে।'

'অশ্লীল? এগুলো অশ্লীল নয়?' সুরমা তেরিয়া হয়ে উঠল।

'কদর্য। কিন্তু আন্দোলন, শুধু কদর্য হলে নয় সঙ্গে সঙ্গে রমণীয় হলে।'

'তা হলে এই অন্যায়ের প্রতিশোধ হবে না?'

দিগন্ত পর্যন্ত তাকিয়ে রইল শিবেশ্বর।

'আছে প্রতিশোধ।' সুরমা জোরালো গলায় বললে, 'যে এ পোস্টার লাগিয়েছে তাকে আমরা ভোট দেব না। না, কিছুতেই না। যেমন কর্ম তেমনি সে ফল পাবে।'

'সে কত দিনের কথা তা কে জানে।' বললে শিবেশ্বর। 'অষ্টগ্রহ কী কাণ্ড বাধায় তার ঠিক কী। হয়তো শেষ পর্যন্ত ভোটই ভুট হয়ে গেল। আর দেয়ালে যেমন পেলেস্তারা তেমনি পেলেস্তারা। না, দেরি নয়, যা করতে হয়, এখুনি!'

নির্বাচনী অফিসে গিয়ে সশরীরে পাকড়াও করল লালমোহনকে।

'আমাদের চট ঝোলাতে বলে আপনি তো দিব্যি পট ঝোলালেন!' শিবেশ্বর প্রায় ফেটে পড়ল।

বদান্যতায় বিগলিত, বেরিয়ে এল লালমোহন।

'আমার বাড়ির দেয়াল কি আপনার পোস্টার লাগাবার জায়গা?' কোমরে প্রায় হাত রাখল শিবেশ্বর: 'দেখবেন চলুন তো কী করেছেন দেয়ালটা!'

'ছি ছি ছি ছি!' মনশ্চক্ষে কল্পনা করেই সহানুভূতিতে গলে পড়ল লালমোহন। 'দাঁড়ান। খোঁজ নিচ্ছি।'

এজেণ্ট গণপতিকে ডাকল। বললে, 'ওঁর গ্রিভান্সটা শোনো।'

গণপতি শুনল। বললে, 'শুধু আমরাই লাগিয়েছি? বিপক্ষ দল লাগায়নি?'

'তারা হয়তো অন্য রাস্তায় গেছে, অন্য বাড়ি ধরেছে।'

'তা হবে হয়তো। কিন্তু মিছিমিছি আপনি এত 'আপসেট' হচ্ছেন কেন?' লালমোহনকে আড়াল করে গণপতিই সওয়াল করতে লাগল।

'বা, আপসেট হব না? আমার দেয়ালটা বেরঙা কদাকার হয়ে গেল আর আমি চুপ করে থাকব?'

'দেশের মঙ্গলের জন্যে এটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে না?' গণপতি নাটকীয় ভঙ্গিতে নির্দেশ করল লালমোহনকে: 'আর উনি দেশের মুক্তির জন্যে কতবার জেল খেটেছিলেন ভেবে দেখুন—'

'দেখেছি।' অদম্য সাহস শিবেশ্বরের। বললে 'কিন্তু কে বলেছিল ওঁকে খাটতে? খাটলেন তো বেরুলেন কেন? যাবজ্জীবন থেকে গেলেই পারতেন।'

'না বেরুলে জনসাধারণের এত উপকার করত কে?'

'আর এই তো সেই পরোপকারের নমুনা! নিরীহ গৃহস্থের ঘরের দেয়াল কলঙ্কিত করে দেওয়া।' শূন্যের দিকে তাকাল শিবেশ্বর: 'এই সব পরোপকারী থেকে ভগবান আমাদের রক্ষা করুন।'

'ছি ছি ছি ছি, নিজেকে পরোপকারী বলি এমন আমাব সাধ্য কী।' লালমোহন দু হাত একত্র করল। বললে, 'আমি আপনাদের সেবক, আপনাদের ভৃত্য, বলতে পারেন, পুরাতন ভৃত্য।'

'পুরাতন ভৃত্য!' গর্জে উঠল শিবেশ্বর: 'পুরাতন ভৃত্য বসন্ত হয়ে কবে মারা গেছে। আগে ভূতের মতন ছিল, এখন স্রেফ ভূত হয়ে গেছে। ভূতের সেবায় আমাদেব কাজ নেই। শুনুন—' ফিরে যাচ্ছিল, রুখে দাঁড়াল। 'যদি আমার দেয়ালের জন্যে খেসারত না দেন তা হলে কিছুতেই ভোট দেব না আপনাকে।'

'সে কী কথা মশাই? সামান্য একটা দেয়ালের জন্যে—'

'হ্যাঁ, তাই।' যেতে-যেতে আবার থামল শিবেশ্বর: 'আপনি আমার দেয়াল নষ্ট করবেন আর আপনাকে আমি ভোট দেব? কেউ দেয় এই অবস্থায়?'

'গণপতি!' লালমোহন ডাকল আকুল হয়ে। 'ব্যবস্থা করো।'

গণপতি ব্যবস্থা করল।

পরদিন সকালে উঠে শিবেশ্বর দেখল তার দেয়ালে অন্য দলের পোস্টারও সার-সার আঠা-মারা।

'এ আবার কারা সাঁটল?'

গণপতি কাছেই কোথায় ছিল, মুখ বাড়িয়ে বললে 'আগে আস্টে-পৃষ্ঠে ছিল এখন একেবারে আস্টে-পৃষ্ঠে-ললাটে হয়ে গেছে। এমন কাঁকুড়ের ক্ষেত পেলে কোনো শেয়ালই ছাড়ে না।' গণপতি আরো সামনে ঝুঁকিয়ে দিল মাথাটা। বললে, 'এবার ভোট দেবেন কাকে?'

'আর কাকে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল শিবেশ্বর। 'কাউকে না। এক ভস্ম আর ছার! এও পোস্টার ও-ও পোস্টার। এও 'বন্ধুগণ' ও-ও 'বন্ধুগণ'! বাছবার কিছু নেই। এও চাঁদের হাট ও-ও চাঁদের হাট।'

'সে কি মশাই, ভোটই দেবেন না তাই বলে?'

'এই তো আপনাদের কাজের নমুনা, নিষ্পাপ গৃহকে কলঙ্কিত করা।' শিবেশ্বর আবার একবার দেখল আগাপাস্তলা। 'যদি পরিচ্ছন্ন থাকতেন পরিচ্ছন্ন রাখতেন, দিতাম নিশ্চয়ই ভোট।'

'যাক, একেবারেই যখন দেবেন না তখন এক হিসেবে মন্দের ভালো।' লালমোহনের দালালমোহন, গণপতি হাসতে হাসতে চলে গেল।

'হ্যাঁ, মন্দের ভালো।' বললে সুরমা। কোমরে আঁচল বাঁধল।

চাকরের সাহায্যে দেয়াল থেকে তুলতে লাগল পোস্টারগুলো। টেনেহিঁচড়ে আঁচড়ে-খুঁচিয়ে জঞ্জালের জাল নির্বংশ করলে।

শিবেশ্বর বিকেলে আপিস থেকে বাড়ি ফিরে এসে দেখল, এ যে এক স্তূপ!

'হ্যাঁ, ওরা বলছিল না, পরোপকার করবার জন্যেই ওরা জীবন ধরেছে, সুতরাং ওদের যুক্তিতেই এই পোস্টারগুলো আমাদের;

লাগবে আমাদের উপকারে।' হাসতে লাগল সুরমা। 'যেগুলো ফোস্কার মতো ফুলে ছিল সেগুলো আস্ত-আস্ত ওপড়াতে পেরেছি। বাকিগুলোরও কতক মন্দ আসেনি, কোনোটা আধখানা, কোনোটা সিকি-দুআনি। তা সব মিলিয়ে সওদা নেহাত মন্দ হবে না।'

'তার মানে?' শিবেশ্বর গম্ভীর মুখে বললে, 'এ সব দিয়ে তুমি কী করবে?'

'কী করব মানে?' সুরমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল: 'কাগজওয়ালার কাছে বেচে দেব। দেয়ালে ফের রঙ দিতে হবে না? তার খরচের কিছু অন্তত উঠে আসুক—'

'না।' গভীরতর হল শিবেশ্বর। 'এ দিয়ে অন্য কাজ হবে।'

রাতে এত শীতের মধ্যে এখনো বেশ কটা লোক ফুটপাতে শোয়। ঘুম যায়। মাঝে একদিন যে হঠাৎ বৃষ্টি হয়েছিল সেদিনও ভিড় আগের তুলনায় কম হলেও, কটা লোক সরু ঝুল-বারান্দার নিচে হাঁটু মুড়ে ঠায় বসে ছিল সারাক্ষণ। কটা লোক আগাগোড়াই ঠাঁইহারা।

তাদের মধ্যে দুটো তেরো চোদ্দ বছরের ছোকরা বিশেষ করে চোখে পড়বার মতো। বেশবাস যতদূর স্বল্প হতে পারা যায়, পরনে একটা করে বেঁটে প্যান্ট আর গায়ে খাটো শার্ট, পাশাপাশি শোয় এসে ফুটপাতে। নিচে আস্তরণ নেই, উপরেও নেই আববণ। তবু আলোর কাছেকার ফালি জায়গাটুকু নিয়ে দুজনের কী দুর্দান্ত ঝগড়া। শত ঝগড়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ঠিক শোওয়া চাই ঘেঁষাঘেঁষি করে। আর শীত যখন অসহ্য তখন ঘুমের ঘোরে কখন তারা পরস্পরকে গায়ের গরমে জড়িয়ে নিয়েছে বুকের মধ্যে তারা নিজেরাই জানে না।

সামান্য একটু আগুন করবার মতো কাঠকুটো নেই—আর, গাছ নেই তো শুকনো পাতা!

একটা জ্বলন্ত বিড়ির ভাগ নিয়ে এতক্ষণ মারামারি করছিল,

এখন শুয়ে পড়বার আগে দুজনে মুখোমুখি বসে হাঁটুতে-হাঁটুতে ঠোকাঠুকি করে কাঁপছে—শিবেশ্বর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বললে, 'আগুন করবি?'

'জ্বালানি পাই কোথা?' উৎসুক চোখে তাকাল দুজনে।

চাকর সেই এক স্তূপ ছেঁড়া পোস্টারের বাণ্ডিল ফেলল ওদের সামনে।

লম্বা-চওড়া আস্ত কাগজগুলোর দিকে ওরা তাকাল লুব্ধ চোখে।

'না, বেচতে পাবি নে।' ধমকে উঠল শিবেশ্বর।

'না, আমি ভাবছিলাম পেতে শোয়া যায় কিনা।' একজন বললে।

'আর আমি ভাবছিলাম গায়ের চাদর করা যায় কিনা।' বললে ছোটটা।

'না, শুধু আগুন করা যায়।'

'তাই করব। দিন তাই দিন।'

বহু বাহুতে টেনে নিল বাণ্ডিলটা। ওদের এখন বুঝি আগুনের খিদে।

ফুটপাতের আরো কটা বাসিন্দে আগুন দেখে বসল ঘন হয়ে। ওদিক থেকেও এল আরো কজন।

কিন্তু যত লোকই আসুক আগুন অনেক, অনেক বেশি হয়ে গিয়েছে। অনেক প্রচণ্ড, অনেক লেলিহান। এত আগুন দিয়ে কি ওরা শুধু গা গরম করবে? বেশি আগুনের কি কোনো বড় কাজ থাকতে নেই?

'জানলাটা বন্ধ করে দাও।' ঘুমো চোখে বললে সুষমা।

'হ্যাঁ, ওরা মজা পেয়েছে।' ক্লান্তস্বরে শিবেশ্বর বললে, 'সারা রাত না ঘুমিয়ে ওরা কেবল কাগজ পোড়াবে।'

কালো কোট

ধর ধর ধর ধর—সমবেত চিৎকারে পাড়া সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

ত্রিলোকেশের বৈঠকখানার লোকগুলোও জানলা দিয়ে তাকাল বাইরে। এলোপাথাড়ি কতগুলো মানুষ ছুটেছে এদিক-ওদিক। আর, একজন ছুটলেই বহুজন ছোটে।

কী ব্যাপার? টেবিলের থেকে মুখ তুলল ত্রিলোকেশ।

'চোর হয়তো।' ভিতরের লোক কে একজন বললে।

'চোর হলে তো চোর-চোর বলত। এ যে ধর-ধর বলছে।' ত্রিলোকেশ বুদ্ধি খাটিয়ে বললে, 'এ নিশ্চয়ই অন্য রকম।'

'চাপা দিয়েছে হয়তো—' আরেকজন কে বললে বিজ্ঞের মত।

'তা হলে তো চাপা-চাপা বলত। নম্বর নিন—নম্বর নিন বলত। এ শুধু ধর-ধর বলছে। নিশ্চয়ই এ অন্যরকম।' ত্রিলোকেশ বেরিয়ে এল রাস্তায়।

ভীষণ রকম অন্যরকম। চোর-ডাকাত নয়, লরি-ড্রাইভার নয়, একটা সামান্য নিরীহ পুরোত।

যত উকিল তত মক্কেল নেই। যত প্রতিমা তত পুরোত নেই।

একশো গজের মধ্যে তিনখানা সরস্বতী। তিনটে বিরাটকায় প্যাণ্ডেল। তিনটে উচ্চৈঃশ্রবা মাইক। কিন্তু পুরোতই ঠনঠন।

মুচি-নাপিতের জন্যে দাঁড়ায়, এখন সবাই পুরোতের জন্যে দাঁড়িয়ে।

তিন দলে আকচাআকচি। সরস্বতীকে কারা বেশি সরস সতী করতে পারে, প্রথমে প্রতিমার উপর দিয়ে গেছে একচোট। শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা হবে 'সাংস্কৃতিকী' নিয়ে, কে কটা আর্টিস্ট জোটাতে পারে। তার আগেই এ কী বিপদ! পুরোত নেই।

আশ্চর্য, পুরোতের কথাই কিন্তু কেউ ভাবিনি।

গণতন্ত্রে আবার পুরোত কী! আমরা সবাই পুরোত।

চলবে না, পুরোতগিরি চলবে না।

যখন একটাকে পাওয়া গেছে ছাড়ান-ছোড়ান নেই। ধর-ধর, টেনে নিয়ে চল, জোর যার পুরোত তার। জোরে না পারিস তো, বেটার টিকি কেটে দে, গা থেকে নামাবলীটা কেড়ে রাখ।

একদল হাত ধরেছে, আরেকদল ঘাড়, তৃতীয় দল ঝুলে পড়েছে কোমর ধরে—গোবর্ধন ভটচাজ ত্রিলোকেশকে দেখে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল: আমাকে বাঁচান, বাঁচান, রক্ষে করুন।

ত্রিলোকেশ দু পা এগিয়ে এল। পূজকদের কিচ্ছু না বলে পুরোহিতকে ধমকে উঠল: 'আজকের দিনে নামাবলী পরে বেরিয়েছেন কেন?'

গোবর্ধন গিবি-গোবর্ধনের মত মুখ করল। ট্রেড-ড্রেস পরব না? আপনি পরেন না?

'ঐ পরেই তো ধরা পড়েছেন। আজকের দিনে কি টিকি দেখাতে আছে? টুপি দিয়ে ঢেকে আসা উচিত ছিল।' খেঁকিয়ে উঠল ত্রিলোকেশ: 'আর পট্টবস্ত্র পরেছেন কোন লজ্জায়? এই দুর্মূল্যের বাজারে ও সব ম্যানেজ করেন কী করে? একটা হাফ-প্যান্ট জোটে না?'

'হাফ-প্যান্ট?'

'হাফ-প্যান্ট পরে লোকে আজকাল বিয়ে করে আর এ তো ঘণ্টা নাড়া। হাফ না হয়, বেশ, ফুল-ই পরতেন। মটকা আর নামাবলীর বদলে যদি আপনার পরনে আজ শার্ট-প্যান্ট থাকত কেউ চিনত না আপনাকে। দিব্যি নিজের কাজে চলে যেতে পারতেন—তা নয়, এখন ট্রেড-ড্রেসের ঠেলা বুঝুন—'

'আমার তবে কী উপায় হবে?' সমুদ্রে ডোবা পাহাড়ের মত আওয়াজ করল গোবর্ধন।

'কী আবার হবে! য়্যাডজোর্নমেন্ট চান।'

পুরোতের সঙ্গে পূজকের দলও মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল।

'মানে দেবীর কাছে মামলার মুলতুবি চান।'

'মুলতুবি?'

'হ্যাঁ, অফিস-আউয়ারের মত পুজোর সময়টাও স্ট্যাগার করে দিন—পঞ্চমীতে না হয় সপ্তমীতে হবে। বিসর্জন যদি পোস্টপোণ্ড হয়, আবাহনই বা হবে না কেন? তা নইলে—'

'তা নইলে—' কাঁদ-কাঁদ মুখ করল গোবর্ধন।

'তা নইলে আমরা যেমন কোর্ট বাড়াবার জন্যে মুভমেণ্ট করছি আপনারা পুরোতরা পঞ্জিকা বাড়াবার জন্যে মুভমেণ্ট করুন। আলাদা-আলাদা পঞ্জিকা আলাদা-আলাদা পুজো। দি মোর দি মেরিয়ার। যত বেশি কোর্ট তত বেশি রোজগার।'

'সে তো মশাই পরের কথা।' অসহায় কণ্ঠে মিনতি করল গোবর্ধন: 'এখন এই সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার পাই কী করে? আপনি যদি এদের বিরোধটা মিটিয়ে দেন স্যার—'

আরেকদল, চতুর্থ দল এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল গোবর্ধনের উপর।

'আসুন আমাদের সঙ্গে। উকিল আবার কবে বিরোধ মেটায়!'

ধর ধর ধর ধর—আদালতের বটতলায় একটা সোরগোল উঠল।

কী হল কী হল—অনেক লোকই ছুটল বটতলার দিকে।

শাস্ত্রে বলে বৃক্ষপ্রতিষ্ঠার অনন্ত ফল। প্রতিষ্ঠিত বৃক্ষে যত পাতা হবে তত বৎসর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গবাস করবেন।

আদালতের বটগাছ কে পুঁতেছিল জানা নেই। তা এ গাছ কারু পুণ্যে আসেনি এসেছে অশান্তিতে। এ গাছে যত পাতা তত মোকদ্দমা। যত ফল তত কলহ।

'গোলমাল কিসের?' সবজজ সর্বানন্দ জিগগেস করল পেশকারকে।

'ফেরার কোনো আসামী-টাসামী ধরা পড়ল বোধ হয়।' বিজ্ঞের মত মুখ করল পেশকার: 'কিংবা কোনো হোস্টাইল সাক্ষী-টাক্ষী হয় তো।'

অব্যাপারে উদাসীন থাকাই বিধেয়। সর্বানন্দ নিজের কাজে মন দিল।

কতক্ষণ পরে আর্দালি এল হাসিমুখে।

'কে ধরা পড়ল?' ব্যস্ত ভঙ্গীতে জিগগেস করল পেশকার।

'উকিল।'

উকিল? সবাই হতবাক হয়ে গেল। কেন? নিশ্চয় তবে মক্কেলের টাকা ভেঙেছে। নয়তো এক পক্ষে ওকালতনামা সই করে আরেক পক্ষের ব্রিফ নিয়েছে।

'উকিলের কাণ্ড!' পেশকার মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

'কে উকিল?' সর্বানন্দ তাকাল আর্দালির দিকে।

আর্দালি অস্ফুটে বললে, 'ত্রিলোকেশবাবু। ত্রিলোকেশ দত্ত।'

'তার তো অসুখ।' অবাক হবাব ভাব করল পেশকার: 'শয্যাশায়ী অসুখ। সে কোর্টে আসে কী করে? নিশ্চয়ই ভুল করেছে। আর কাউকে ধরেছে।'

'আমি নিজের চোখে দেখে এলাম।' আর্দালি দৃঢ়তর হল।

নিজের কাজেব মধ্যে চোখ রেখে সর্বানন্দ বললে, 'আজ যখন অসুখ তখন আর কোর্টে এল কেন?'

'ভেবেছিল বিকেলের কাচারিতে কেউ টের পাবে না।' আর্দালি হাসল: 'পক্ষরা যে এখনো পর্যন্ত থেকে যাবে বুঝতে পারেনি। শুধু ছিল না, একেবারে ওৎ পেতে ছিল।'

'গায়ে কালো কোট?'

'পুরোদস্তুর।'

'আজ যখন অসুখ, অন্য কোট পরে এলেই হত।' সহানুভূতিতেই বললে সর্বানন্দ: 'কালো কোটটার জন্যেই চিনে ফেলেছে চট করে।

আচ্ছা,' সর্বানন্দ পেশকারের দিকে তাকাল : 'আমি ডাকছি বললে কি আসবে ?'

'মনে হয় না।' বিজ্ঞতর মুখ করল পেশকার।

'বলবেন মামলা তো য়্যাডজোর্নড হয়েই গিয়েছে, তবে আব ভাবনা কী। সে অর্ডার তো আর নাকচ হবার নয়। বরং এখন যে অবস্থাটা হয়েছে, তার থেকে কী করে ত্রাণ পেতে পারে তারই জন্যে তো কোর্টের কাছে তার আসা দরকার। জানাজানি হতে তো আর বাকি থাকবে না। বিপক্ষ দল একটা এফিডেভিটও করে বসতে পারে। দেখুন তো পান কিনা—'

'এতক্ষণে হয়তো সটকান দিয়েছে।' পেশকার আর্দালিকে নিয়ে খুঁজতে বেরুল।

প্রথম কাচারিতে সব চেয়ে বুড়ো মামলাটারই ডাক পড়েছিল সর্বাগ্রে। একপক্ষে উকিল ত্রিলোকেশ, আরেক পক্ষে উকিল অরবিন্দ।

পক্ষের অসুখ, সাক্ষীর অসুখ, অনেক-অনেক অজুহাতে মোকদ্দমা মুলতুবি হতে হতে চলেছে। একটা না একটা প্রতিবন্ধক আছেই। কিছুতেই নিষ্পত্তি হতে পারছে না। এমন কাণ্ড, শাখা-প্রশাখায় গাছের কাণ্ডই প্রায় অদৃশ্য।

এখন আবার নতুন ব্যাধি, উকিলের অসুখ হওয়া সুরু হয়েছে।

আজ মোকদ্দমায় ডাক পড়তেই, বাদীর তরফ থেকে দরখাস্ত পড়ল—তার উকিল ত্রিলোকেশ শয্যাশায়ী অসুস্থ, সুতরাং দিন চাই।

'মিথ্যে কথা, স্যার।' বিবাদী পক্ষ গর্জন করে উঠল। 'আমরা এফিডেভিট করব।'

'সে কি, আপনাদের উকিল অরবিন্দবাবু যে পিটিশনে কনসেণ্ট দিয়েছেন।' সবজজ বললে সবিনয়ে।

'সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি, স্যার।' বিবাদী পক্ষের

তদবিরকারটা বেশি ক্ষেপা, চিপটেন কাটল : 'এক শেয়াল আরেক শেয়ালের মাংস খায় না।'

'অরবিন্দবাবুকে ডাকুন।' হাকিম বললে।

অরবিন্দ এসে বললে, এ পিটিশন আমি 'অপোজ' করব না। উকিলের অসুখ হয়েছে, এতে আবার কথা কী! অসুখের উপর কারু হাত নেই। আজ ত্রিলোকেশবাবুর হয়েছে, কালকে আমার হতে পারে। স্বয়ং ধন্বন্তরিরই অসুখ হয়, আমরা কোন ছার! এর আবার এফিডেভিট কিসের? এ পক্ষ এফিডেভিট করলে ও-পক্ষে কাউণ্টার এফিডেভিট ঝাড়বে। এক ভদ্রলোকের অসুখ নিয়ে এত কী হৈ-চৈ!

উকিলের অসুখ। অন্য পক্ষের উকিলের সমর্থন। এর পরে আর কলম চলে না। সবজজ মামলার তারিখ ফেলল।

পেশকারের ভালো লাগল না। ভেবেছিল, হাকিম কড়া হবে। বিবাদী এফিডেভিট করতে চেয়েছিল, করত। অপর পক্ষ কাউণ্টার এফিডেভিট করত না আরো কিছু। ত্রিলোকেশের জুনিয়র কী করছে? সে মামলা চালাতে পারে না? জুনিয়রকে কিছু দেবে না, সবই নিজে খাবে এ কেমন কথা? বার-লাইব্রেরিতে উকিল কি ঐ এক ত্রিলোকেশ?

'মামলাটা ভীষণ ওল্ড, স্যার।' পেশকার বললে অসন্তোষে।

'তা কী করা যাবে। বুড়োগুলোই বেশি বাঁচে। বাঁচুক যতদিন লিখেছে কুষ্ঠিতে।'

স্বর স্বগতে নিয়ে এল সবজজ : 'সে সব দিন কি আর আছে! এখন সব স্বাধীন, গণতন্ত্র। শেষে বার-লাইব্রেরিতে মিটিং করুক, হাকিম উকিলের অসুখ বিশ্বাস করেনি। এসেম্বলিতে কোশ্চেন হোক। মারা যাই আর কী। আর যাই হোক, উকিল চটিয়ে চাকরিতে কিল খেতে রাজী নই।'

'কিন্তু স্যার, আমাদের কস্ট্ দিন—য়্যাডজোর্নমেণ্ট কস্ট্।'

বিবাদী পক্ষ কাতরস্বরে বললে, 'কত খরচা করে কাজকর্ম কামাই করিয়ে সাক্ষী নিয়ে এসেছি।'

'না, না, উকিলের অসুখে আবার কস্ট্ কী!' অরবিন্দই চাইল মক্কেলকে প্রবোধ দিতে: 'তারপর পরের দিন আমার অসুখ করুক তখন আবার এই কস্ট্ ওরা সুদে-আসলে উশুল করে নিক।' হাকিমের দিকে তাকাল অরবিন্দ, দরাজ গলায় বললে, 'কস্ট্ আমি প্রেস কবি না।'

শত্রুপক্ষের প্রতি কী করুণা! কী উদার বোধ!

বিবাদী পক্ষ মুখ চুন করে বেরিয়ে গেল কোর্ট থেকে।

তারপরেই টিফিনেব পর বিকেলের কাচারিতে ঐ মার-মার রব।

বিবাদী পক্ষের এক দঙ্গল লোক হাকিমেব খাস-কামরায় ঢুকে পড়ল।

'ত্রিলোক উকিলকে ধরে ফেলেছি, স্যার। বটতলায় মাচাব উপর বসে চা খাচ্ছে।'

'তা আমাব কী করবাব আছে!' সর্বানন্দ সিগাবেট ধবাল।

'ওর অসুখ-টসুখ সব বাজে কথা, স্যাব।' দলের থেকে কে আরেকজন বললে, 'ও সকালের কাচাবিতে শেয়ালদা কোর্টে কেস করতে গিয়েছিল।'

'বাজে কথা।' এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল সর্বানন্দ।

'আমি এফিডেভিট করব।' দলের কে আরেকজন তড়পে উঠল।

'শেষে হয়ত দেখা যাবে শেয়ালদা নয় স্মল কজ কোর্টে গিয়েছিল—' সর্বানন্দ হাসল: 'তখন আবাব ফল্‌স এফিডেভিটের দায়ে পড়বেন।'

'কিন্তু বুঝুন স্যার, যে লোকটার নাকি শয্যাশায়ী অসুখ, সে দিব্যি কোর্টে এসে তারিয়ে-তারিয়ে চা খাচ্ছে।'

'তাতে অপরাধটা কোথায়? সকালবেলা শরীর খুব খারাপ হয়েছিল, হয়তো বায়ু-বৃদ্ধি হয়ে হার্টে ধড়ফড়ানি সুরু হয়েছিল,

বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিতে হয়েছিল, সেটাকে আপনি শয্যাশায়ী অসুখ বলবেন না?'

'কিন্তু—'

'হ্যাঁ, বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে শরীরটা সুস্থ হয়েছে, বিকেলের দিকে কোর্টে একটু হাওয়া খেতে এসেছেন।' সর্বানন্দ মধু ঢেলে বললে, 'জানেন তো মামলা থাক বা না থাক, কোর্টে একবার ঘুরে না গেলে অনেক উকিলেরই অনিদ্রা হয়। তেমনি হয়তো অসুস্থ শরীর নিয়েই এসেছে একবার বেড়িয়ে যেতে। মানুষের এক বেলার জন্যে কি শয্যাশায়ী অসুখ হয় না?'

'তা যদি বলেন—'

'তা ছাড়া মামলায় অলরেডি তারিখ পড়ে গিয়েছে, এখন আর কী করা যাবে। এখন উকিলকে কাটলেও কিছু নেই। এখন দেখুন, পরের দিন সবাই সুস্থ থাকে—আমি সুস্থ থাকি!'

এরপরে আর কথা নেই। নিস্তেজের মত সদলে চলে গেল বিবাদী।

তারপরেই ঢুকল ত্রিলোকেশ।

গায়ের কালো কোটটা ধরে কারা টানাটানি করেছে বুঝি। ধুলো-কাদা লাগানো। দু কনুইয়ে দুটো গর্ত আগের থেকেই হয়ে আছে, একটায় বুঝি নতুন টান দিয়ে ছেড়া। সব মিলিয়ে কেমন আর্ত-করুণ চেহারা।

বাইরে শুনেছে হাকিমের কী মনোভাব! আর কে না জানে হাকিমকে জানাই চরম জানা।

'সকাল থেকেই হাঁপানিটা নিদারুণ বেড়েছিল, স্যার—' ক্লান্তের মত চেয়ারে বসল ত্রিলোকেশ।

'তা সারল কিসে? শেয়ালদার টনিকে, না, ছোট আদালতের?'

আর্ত এবার কিঞ্চিৎ ধূর্ত হল। কথাটার পাশ কাটিয়ে দিব্যি বললে, 'এখনো টানটা পড়েনি। শুধু আপনি ডেকেছেন বলে—'

'ও, হ্যাঁ,' সর্বানন্দ মায়া মিশিয়ে বললে, 'আমি বলছিলাম বিকেলের দিকে যদি এলেনই তবে কালো কোটটা পরে এলেন কেন? কালো কোটটা গায়ে ছিল বলেই তো ওরা চিনতে পারল। ধরাধরি টানাটানি করে ছিঁড়ে দিল! এমনি একটা অর্ডিনারি কোট পবে এলেই তো হত!'

'এ কালো কোট ছাড়া আমার আর কোট কোথায়!' ত্রিলোকেশ মুখ দিয়ে নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করল বার কতক।

'কিন্তু য়্যাট অল আসবার কী দরকার ছিল?' সর্বানন্দ শাসনের সুরে বললে, 'অমন পিটিশনের পর পুরো দিনটাই তো গা ঢাকা দিয়ে থাকা উচিত ছিল। অমন রিস্‌ক কেউ নেয়? দেখুন তো কালো কোটটা—'

আমতা-আমতা করে ত্রিলোকেশ বললে, 'মুন্সেফ কোর্টে ছোট একটা কাজ ছিল, তাই আসা।'

'কী কাজ?'

'একটা কেসে আমার মক্কেলের বিপক্ষ দল সময়ের দরখাস্ত করেছে—'

'কোন গ্রাউণ্ডে? উকিলের অসুখ?'

'না, উকিলের স্ত্রীর অসুখ।' মিটমিট করে তাকাল ত্রিলোকেশ।

'তাতে আপনার কী বলবার আছে?'

'না, কিছু বলবার নেই। আমি সেই দরখাস্তে কনসেণ্ট দিতে এসেছি।'

'কনসেণ্ট?'

'হ্যাঁ, স্যার। জানেনই তো কনসেণ্টের জন্যে বিপক্ষের থেকে একটা ফি পাওয়া যায়।' মুখ ছেড়ে নাক দিয়েই কখন নিশ্বাস ফেলল ত্রিলোকেশ।

'আর য়্যাডজোর্নমেণ্ট কস্ট্ প্রেস না করলেও কিছু পাওয়া যায়, তাই না?'

'কখনো যায় কখনো যায় না। আপনার কাছে কী লুকোব, স্যার। মক্কেল ভাঙিয়েই তো আমাদের খাওয়া—'

'কিন্তু আপনার কালো কোটটা যে ছিঁড়ে গেল, এটাই যা আপসোস।' কনুই দুটোর দিকে তাকাল সর্বানন্দ।

'না, আপসোস কী! কোট ছেঁড়ার মধ্যেও একটা আভিজাত্য আছে। ছেঁড়া কোট দেখে লোকে ভাববে সিনিয়র হয়েছি।' ব্যাপারটা পুরোপুরি মনে পড়তেই ত্রিলোকেশ মুখ দিয়ে ফের নিশ্বাস ফেলতে লাগল। 'তাই কোনো দুঃখই দুঃখ নয়। কালো কোটেও লাইনিং আছে।'

সারপ্রাইজ ভিজিট

খবরের কাগজে দেখলাম বমডিলার পতনের পর চীনদরদী ক'টা বাঙালি বিভীষণ ঠোঙায় করে খাবার কিনে এনে খেয়েছে।

মনে পড়ল।

তখনও দেশ ভাগ হয়নি, এক মফঃস্বলী সদরে মুন্সেফিতে আছি। বদলির অর্ডার এসে গিয়েছে, সেরেস্তাদারকে চার্জ দিয়ে জয়েনিং টাইম 'এভেইল' করছি। জিনিসপত্র প্যাক হচ্ছে।

হঠাৎ সন্ধ্যের দিকে ছোকরা এক আমলা এসে হাজির।

এখন তো উদীয়মানের কাছেই যাওয়া উচিত, অস্তায়মানের কাছে কে আসে।

'স্যার, ওরা ফিস্টি করছে।'

'কারা?'

'কোর্টের আমলারা।'

'উপলক্ষ্য?'

'আপনি বদলি হয়ে গিয়েছেন, তাই।'

তার মানেই শত্রুপক্ষের পতন হয়েছে বলে উল্লাস। আমিও উল্লসিত হলাম যেহেতু বিভীষণরাও নিরাপদ নয়। বিভীষণের মধ্যেও বিভীষণ।

বললাম, 'তা ওদের ঘুষ-ফুস নিতে অসুবিধে হচ্ছিল—আমি চলে গেলে ফুর্তি তো হবেই—'

'স্যার, একবার সারপ্রাইজ ভিজিট দেবেন?'

চার্জ দিয়ে দিয়েছি, সারপ্রাইজ ভিজিট দেবার আর এক্তিয়ার কই? তবে বাঙালি মতে এমনি গিয়ে পড়লে কে আটকায়।

বললাম, 'চলুন।'

হাকিমি পোশাক নয়, সাদাসিধে ঘরোয়া ধুতি-পাঞ্জাবিতেই চললাম। শুধু র‍্যাপার দিয়ে মুড়িসুড়ি দিলাম—যা কনকনে শীত।

'এই যে এস। এত দেরি করলে কেন?' সেরেস্তাদার স্বয়ং অভ্যর্থনা করল: 'শালা ভেগেছে এত দিনে। চার্জ দিয়ে দিয়েছে।'

বুঝলাম দেখামাত্রই চিনতে পারেনি আমাকে। কোনো অনুপস্থিত আমলা বলে ভুল করেছে।

বললাম, 'কই আমার ঠোঙা কই?'

যা কণ্ঠস্বর, পলকে চিনে ফেলল।

'স্যার, স্যার—' সকলের প্রায় নাড়ী-ছাড়ার অবস্থা।

'বা, ফিস্টি তো ভালো কথা। কিন্তু আমাকে বাদ দিয়ে কেন? যার জন্যে ফিস্টি তারই নেমন্তন্ন নেই? আমার একটাও ফেয়ারওয়েল মিটিং হয়নি, এইটেকেই বরং তাই করা যাক। খাবার ঠোঙায় কেন, প্লেট নিয়ে আসুন। আর ওপেনিং সং গাইবার জন্যে একটা হারমোনিয়ম—'

কেউ বা প্লেট আনবার কেউ বা হারমোনিয়ম আনবার নাম করে কেটে পড়ল।

সেই রাত্রেই ট্রেনে করে কলকাতা গেলাম। সকালে হাইকোর্টে দেখা করতে গেলাম রেজিস্ট্রারের সঙ্গে। ভাগ্যক্রমে রেজিস্ট্রার ইংরেজ।

স্থানীয় জেলাজজকে বাই-পাশ করে গেলাম। প্রথম কারণ, চার্জ দিয়ে দেবার পর সে আর আমার জজ নয়; দ্বিতীয় কারণ, বাঙালি "ইউরোপীয়ান" জজের রসবোধ নেই বললেই চলে।

কার্ড পাঠালেও সহজে ডাকছেন না রেজিস্ট্রার। সে নির্ঘাত বুঝেছে বদলি ক্যানসেল করতে এসেছি। আর ওজুহাত সেই মামুলি—স্ত্রীর ডেলিভারি আসন্ন।

'কী, স্ত্রী অসুস্থ?' ঘরে ঢুকতেই হুমকে উঠল রেজিস্ট্রার।

হাসলাম। বললাম, 'না, স্যার। বদলি রদ করবার তদবিরে আসিনি। শুধু একটা গল্প বলতে এসেছি।'

'গল্প?'

'হ্যাঁ, এখন না বলে গেলে বলবার আর চান্স পাব না কোনোদিন।'

বলে সব ব্যক্ত করলাম।

রেজিস্ট্রার গম্ভীর মুখে বললে, 'তোমাব প্রতি ওরা এত বিরূপ কেন?'

'ঐ সারপ্রাইজ ভিজিট।' হাসলাম। 'একেবারে না বলে-কয়ে কোনো পূর্বাভাস না দিয়েই সারপ্রাইজ ভিজিট। কখনো-কখনো সরাসরি এজলাস থেকে বেরিয়ে গিয়ে। কখনো বা অফিস-টাইমের বাইরে, রাত্রে।'

'কিছু আবিষ্কার করেছ?'

'তার আর লেখাজোখা হয় না। উকিল নথি থেকে সারেপটিসাস কপি নিচ্ছে, আউটসাইডাররা ভাড়ায় কাজ করছে, আমলারা সাইকেলে বেঁধে নথি নিয়ে যাচ্ছে বাড়িতে, আর সেরেস্তাদার দিব্যি খালি গা হয়ে থেলো হুঁকোয় তামাক খাচ্ছেন—'

'কিছু সুফল হয়েছে?'

'সুফলের মধ্যে প্রেসিডিং কবে-কবে নিজের কাজ বাড়িয়েছি আর পেছন থেকে চুপি চুপি এসে সেরেস্তাদারের হুঁকো থেকে জ্বলন্ত কলকে তুলে নিতে গিয়ে হাত পুড়েছে। আর, শেষ পর্যন্ত, ঐ ফিস্টি—'

'তুমি কি আজই ফিরে যেতে চাও?'

'হ্যাঁ, তা, আজই।'

'তবে নেক্সট ট্রেনেই ফিরে যাও। আর অর্ডারের য়্যাডভান্স কপি নিয়ে যাও সঙ্গে করে।'

পরদিন যথাসাজে কোর্টে গিয়ে কলিং বেল-এ বাড়ি মারতেই হৈ-হৈ পড়ে গেল। সেরেস্তাদার কাছে এসে দাঁড়ালেন। এ কী।

বললাম, 'চার্জ টেক ওভার করব। বদলি রদ হয়ে গেছে।' অর্ডারের য়্যাডভান্স কপিটা দেখালাম। 'আর শুনুন, অফিসে এখন আমি একবার সারপ্রাইজ ভিজিট দেব। সব টিপটপ করে রাখুন। ভিড়ভাড় সরিয়ে দিন। হুঁকো-কলকে সরা-মালসা—সমস্ত। আর যদি কালকের ঠোঙা-ফোঙা থাকে, তাও। আর শুনুন,—' সেরেস্তাদার আবার ফিরল। 'সিগারেট খান না? সিগারেটটা মন্দ কী! চট্ করে বাইরে ফেলে দেওয়া যায় ছুঁড়ে। এই নিন একটা—দেখুন—'

'না স্যার, না স্যার—' পায়ে যেন হাড়-মাংস নেই এমনি টলতে-টলতে চলে গেল সেরেস্তাদার।

এজলাসে উঠে চেয়ারে গিয়ে বসলাম।

মনে পড়ল।

তার মানেই বমডিলা আবার অধিকৃত হল।

বিভীষণরা বোধ হয় আরো একবার খাবে। ভাব দেখাবে আমার ফিরে-আসা যেন ওদেরই ফিরে-পাওয়া।

কাঁটালের মাছি

'শ্রাবণগগনে ঘোর ঘনঘটা, নিশীথযামিনী রে—' কথাটা কি 'শাওন' নয়? তা, ওরকম এক-আধটু বিচ্যুতি কানে না তুললেও চলে। 'কুঞ্জপথে সখি, কৈসে যাওব অবলা কামিনী রে—'। যে মেয়েটি গান গাইছে ও নিজেকে অবলা কামিনী বলছে ও বলার দরুন তার আপিস-সহচারিণীরা মুখ টিপে হাসছে তাও না হয় উপেক্ষা করা গেল। সেই একবার এক মেয়ে-ইস্কুলের সভায় নিচু ক্লাসের ছোট-ছোট ছাত্রীরাও তো নিজেদের অবলা বলেছিল। এস-ডি-ওর স্ত্রী এসেছিল, যেমন রেওয়াজ, পুরস্কার বিতরণ করতে। তাকে সংবর্ধনা করবার জন্যে সমবেত সংগীতের ব্যবস্থা। লাইন বেঁধে উঠে দাঁড়িয়ে কচি গলায় গান ধরল মেয়েরা:

এস গো মা সরস্বতী, আমরা অবলা
তুমি বাজাও হার্মোনিয়াম আমরা তবলা।

গান যিনি বেঁধেছেন তাঁকে নিঃসংশয়ে প্রশংসা করতে হয়। গানের নিহিতার্থটি গভীর। হে মহীয়সী, হে আদর্শরূপিণী, তুমি উচ্চগ্রামে যে সুর ধরেছ, আমরা যেন তার সঙ্গে তাল ফেলে চলতে পারি। তা ছাড়া অবলার সঙ্গে মেলবার জন্যে তব্‌লাকে তবোলা করে নেওয়ার মধ্যেও বাহাদুরি আছে। সুরের গরজে হসন্তকে ওকারান্ত হতে দোষ নেই, নইলে মিল যে নিটোল হয় না। তবলার কি কম খাতির? সেবার মাইকে গায়কের নাম ঘোষণা করে দেবার পরও গান হচ্ছে না দেখে সবাই যখন চঞ্চল হয়ে উঠেছে তখন শোনা গেল তবলাবাদকের নাম প্রচার করা হয়নি বলেই এই দুর্নিমিত্ত। যে শুধু পরপদানুবর্তী হয়ে ঠেকা দিয়ে যায় তারও ঠেকার কম নয়। তাই শরীরে যার পদার্থ নেই বললেই চলে সে যদি নিজেকে অবলা

বলে, অসঙ্গত বলে না। আপত্তি সেই দিক থেকে নয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শ্মশান-ফাটা রৌদ্রে রবীন্দ্রজয়ন্তী হচ্ছে—শনিবার বলে আপিস তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে যাওয়ার দরুন দুপুরের দিকেই সভা—এতেই বা অভিযোগের কি কারণ আছে। জ্যৈষ্ঠের দীর্ণ-দগ্ধ রিক্ততাকেই না হয় বর্ষার ঘনঘটা কল্পনা করা গেল, ক্রূরাত্মা দ্বিপ্রহরকেই না হয় সুখসেব্যা নিশীথযামিনী—কী আসে যায়! কল্পনায় অবগাহন করব বলেই তো এই সব সুধাসত্র।

না, এতে মামলা দায়ের করবার কী আছে!

এতক্ষণ উদ্বোধন সংগীত হল। এবার প্রারম্ভিক সংগীত হবে। তারপর হবে আনুষ্ঠানিক।

প্রারম্ভিক সংগীত গাইছেন আপিসেরই আরেকটি কর্মিণী।

'শ্রাবণ—

আবার শ্রাবণ! তবে কি এবার 'শ্রাবণ বরিষণ পার হয়ে,' না কি 'শ্রাবণ মেঘের আধেক দুয়ার ঐ খোলা!' বেশিক্ষণ নিঃশ্বাস চেপে থাকতে হল না—আবার সেই 'শ্রাবণগগনে ঘোর ঘনঘটা'ই শুরু হল। কী ব্যাপার? তবে কি উদ্বোধনী ঠিকমত গাওয়া হয়নি বলেই দ্বিতীয় নায়িকা সংশোধনী গাইছেন? স্বরলিপির মধ্যেও তো দলাদলি আছে, সরকারী-বেসরকারী আছে। না, কই, তেমন তো কিছু মনে হচ্ছে না। সেই একই তো চলন-বলন ঠমক-গমক, একই তো রঙ্গ-তরঙ্গ। তবে এমন কেন হল? উদ্যোক্তাদের অগ্রণীকে কে একজন সবিনয়ে জিগগেস করলে। কে জানত মশাই এদের গানের মাস্টার এক এবং এই একখানা রবীন্দ্রসংগীতই এদের দোরস্ত। এ সভায় তো আর আধুনিক চলবে না।

কিন্তু সে সভায় কালোয়াতি চলেছিল।

'আমরা মশাই রেডিও আর্টিস্ট—

এ এক নতুন বিশেষণ চালু হয়েছে। সবাই ভক্তিতে চোখ বড় করে তাকাল।

'আমরা কেউই রবীন্দ্রসংগীত জানি না। আমরা খাস ক্ল্যাসিক্যাল।'

এও বিরাট গৌরবের কথা। তাই সই, বসে পড়ুন সদলে। খাপছাড়া তলোয়ার চলে, ঢালছাড়া খেলোয়াড়ও চলবে।

তবু তো অফিসারিকা মেয়ে ছুটি গানটি আগাগোড়া মুখস্থ বলতে পেরেছে। সেবার সে সভায় রবীন্দ্রসংগীত গাইবে মেয়ে—সব ঠিকঠাক, রুদ্ধশ্বাস জনতা, তবু গানের শুরু হবার নাম নেই। মাইক এসেছে, বাজনা এসেছে, গায়িকা আসনস্থা, তবু টুঁ শব্দটি নেই। কী হল? ঠেকল কিসে? 'গীতবিতান' আসেনি।

নাই ঢাল, নাই পাত, চড়িয়ে দাও শুধু ভাত—এ কখনো হয়? 'গীতবিতান' কই?

'গীতবিতান' ছাড়া আট-দশ লাইনের একটা গান হয় না।

সভাকৃৎদেরও বলিহারি। চারদিকে ছোটাছুটি, তবু একখানা 'গীতবিতান' যোগাড় হল না। ফল? নিষ্ফল। গান হল না মেয়েটির। চাউনিতে অগ্নিশর হেনে তির্যক ভঙ্গি করে হাতব্যাগ নিয়ে উঠে পড়ল। চলে গেল সভা ছেড়ে।

ধর্ ধর্ ধর্ ধর্—চারদিকে রব উঠল কিন্তু কাগজের টুকরোটাকে ধরা গেল না।

সেবার জয়ন্তী হচ্ছে কোনো এক মানী লোকের বৈঠকখানায়। যাকে বলে ঘরোয়া বৈঠক। সংস্কৃতির সমস্ত সরঞ্জাম নিটুট; আলপনা, ধূপ, রজনীগন্ধার ডাঁট—সবই বহাল আছে, এমনকি দরজায় উর্দিপরা চাপরাশি মোতায়েন। কোন এক উচ্চ পুচ্ছের বিহঙ্গম আসছেন, তাই শহরের সমস্ত ট্রাফিক-কনস্টেবল এই গলির মোড়ে এসে গাঁদি মেরেছে।

আব, ঐ দেখুন—

সে সব নোট পরে নেব, এখন গান শুনি।

মেয়েটি বুদ্ধিমতী। বৈষ্ণবের বাড়িতে 'গীতবিতান' পাবে এমন

আশা দুরাশা। বৈষ্ণব? তা ছাড়া আবার কি। বৈ মানে কিছু নয় আর কিছু নয় বলেই ধরা যেতে পারে, বিশেষ। বিশেষরূপে যে স্নব সেও বৈষ্ণব। মরণকালে গীতা পাবেন না, স্মরণকালে গীতবিতান!

তাই মেয়েটি বুদ্ধি খরচ করে গানটা একটি কাগজের টুকরোয় লিখে এনেছিল। কাগজের টুকরো হার্মোনিয়ামের উপর রেখে গাইতে হলে একটা কিছু দিয়ে চাপা দেবার দরকার হয়। মেয়েটি এক হাতে হাঁপর মারবে আরেক হাতে চাবি টিপবে, সেই ক্ষেত্রে কাগজের টুকরো সামলায় কে? যারা 'গীতবিতান' খুলে গান গায় তারা তাদের হ্যাণ্ডব্যাগ দিয়েই খোলা পৃষ্ঠা চাপা দেয়। সেইটেই সংস্কৃতির চিহ্ন। কাগজের টুকরোর বেলায় একটি বেশ পাথরের নুড়ি-টুড়ি হলেই ভালো হয়। গৃহস্বামী তাই একটি যেচে-বেছে যোগাড় করে আনলেন। উপরে পাখা ঘুরছে, মেয়েটি গাইছে তন্ময় হয়ে—'কেনরে এতই যাবার ত্বরা!' পাখার দাপটে নুড়িটি একটু নড়ে গেল, অমনি কাগজের টুকরো ছুট দিল হাওয়ায়। ধর্ ধর্—মেয়েটি ব্যাকুল হাত বাড়াল—ধর্ ধর্—সমবেত জনতা হাহাকার করে উঠল। বিদায় রাতের উতলাকে কত পিছু ডাকল, শুনল না সেই উদাস পাখি, উড়ে চলে গেল দরজা দিয়ে। ফল? নিষ্ফল। গান বন্ধ।

'এবার আবৃত্তি। আবৃত্তি করছেন—

কান খাড়া করলাম।

'সঞ্চয়িতা' খুলে পড়তে শুরু করল শ্রীমান। এ কি, পড়ছে যে? হতে পারে অভিধানে পাঠও যা আবৃত্তিও তাই। তবু মনের থেকে বলবে এইটিই প্রথাসিদ্ধ।

কিন্তু যখন একবার পড়তে পেরেছে তখন আর পায় কে। একটা দীর্ঘকায় কবিতাই নেয়া যাক। আর যখন এটা রবীন্দ্র-জন্মোৎসব তখন 'পচিশে বৈশাখ'টাই তো সমীচীন।

কার অত সময় আছে বসে-বসে মুখস্থ করে। ছা-পোষা কেরানি আমরা, বলে, বই-ই কিনতে পারি না। সুতরাং—

সুতরাং, পড়ুন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। যতক্ষণ প্রাণ চায়। কিংবা প্রাণ যায়!

কিন্তু বক্তৃতার মধ্যে হঠাৎ পকেট হাটকাতে শুরু করেছেন কেন? পকেটের ভারলাঘব ঘটে গেছে নাকি? কখন ঘটল? রাস্তায়? এতক্ষণে টের পেলেন বুঝি? নাকি সদ্য সদ্যই ঘটল, এই সভাতে, এই রঙ্গমঞ্চেই?

এ-পকেট ও-পকেট আগাপাশতলা খুঁজছেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে। বা, ঐ তো, ঐ তো, মনিব্যাগ বেরিয়েছে।

মনিব্যাগ নয়, উদ্ধৃতি খুঁজছেন। বক্তৃতায় জায়গায় জায়গায় জুতসই কোটেশন লাগাবেন বলে কতগুলি কবিতার অংশ একটা কাগজে টুকে এনেছিলেন, সেই কাগজের টুকরোটা খোয়া গেছে। সুতরাং গ্রন্থনসূত্রই যদি না থাকে মালা কোথায়!

না, স্মৃতিধৃতিও দেখেছি। যিনি মুখস্থ বলছেন তাঁর পিছনে প্রম্পটার। এক সভায় শুধু প্রথমোক্তর নাম ঘোষিত হবার পর দ্বিতীয়োক্ত আপত্তি করেছিল। বলেছিল, দেখুন বিবেচনা করে, আমাদের দাবিও অন্যায্য নয়। যদি তবলা-বাদক খোল-বাদক খঞ্জনি-বাদক সবাই ঘোষণা পায়, আমরা অনুস্মারকের দল, আমরা কেন পাব না? তাছাড়া এমন ক্ষেত্রও বিরল নয় যেখানে কে বলছে আর কে ঠেলছে প্রভেদ করা যায় না। সুতরাং প্রম্পটারেরও ঘোষণা চাই।

কী বিপদ, রবীন্দ্রনাথেরও 'শাপমোচন' আছে নাকি?

প্যাণ্ডালের টিকিটঘরে খুচরো টিকিট-ক্রেতাদের ভিড় দেখেই তখন সন্দেহ হয়েছিল। প্লে আরম্ভ হতেই হৈচৈ কাণ্ড। রুপোলি পর্দার ছায়াময়ীকে শরীরিণী দেখবে এই স্বপ্নেই বোধহয় সকলে উন্মুখ হয়ে ছিল, কিন্তু এ কি ফেরেববাজি?

এ ফিল্মের 'শাপমোচন' নয়, এ অন্য ব্যাপার।

অন্য ব্যাপারে আপনারা থাকুন। আমাদের দাম ফিরিয়ে দিন।

'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে—

ও সব ভাবের গান চলবে না। জনতার মধ্যে থেকে ক'জন হুঙ্কার করে উঠল।

কী চলবে?

হয় হারে রেরে, নয় তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ। ঝঞ্ঝার ঝঞ্ঝনা একটা আছে না? নইলে সেইটে।

একজন বললে, অন্তত মারো টান হাঁইয়ো।

'এবার কবির আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান।'

সভাপতির বক্ষ প্রায় বিদীর্যমান। এ কি, এ তো মাইকেল!

একজন কানে-কানে বললে, 'গিরিশ ঘোষও ভাবতে পারেন।'

গরিব ক্লাব, কোনোক্রমে একটি প্রস্তরমূর্তি যোগাড় করেছে। একটু ইতরবিশেষ করে সমস্ত পালপার্বণেই চালিয়ে দিচ্ছে। সেই যে শুনেছিলাম এক দেশনেত্রীর তিরোধান হয়েছে, কোন এক দৈনিক কাগজ তাঁর ছবির ব্লক পাচ্ছে না; স্বাস্থ্যদায়িনী কি এক বটিকার বিজ্ঞাপনে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গী এক যুবতীর ছবি আছে—সম্পাদক বললেন, সেই বটিকার ব্লকটাই একটু ঘষে মেজে চালিয়ে দাও এবার।

মূর্তি কে দেখে! মূর্তি তো মায়া!

আর সংস্কৃতি মানেই তো ফরাস। ফরাসি যে কেন নয় তা কে বলবে।

'সুতরাং দুটো জিনিসের উপর যদি চোখ রাখতে দেন তাহলে সভাপতি হতে রাজি আছি।'

'বেশ তো, কী জিনিস? আপনি কেন, আমরাই রাখতে পারব।'

'মাপ করবেন, প্রাণে নিশ্চিন্ততার নিরবচ্ছিন্ন সুধাসিঞ্চন চাই। তাই আপনাদের নজর রাখলে চলবে না, আমাকেই রাখতে হবে।'

'বলুন না কী জিনিস?'

'এক, জুতো; দুই, ফিরে যাবার গাড়ি। ও দুটি বস্তু চোখেব সামনে বহাল তবিয়তে আছে দেখলেই জগৎ আনন্দময়। 'আনন্দধাবা বহিছে ভুবনে—।' সুতরাং এমন জায়গায বসাবেন যেখান থেকে জুতো আব গাড়ি সবাসবি চোখে পড়ে।'

'বলতে বলতে যখন তন্ময় হয়ে যাবেন তখন জুতোব দিকে কি আর মন থাকবে?'

'যতই তন্ময় কবে দিন না কেন, জুতো ভুলব না। শ্রীবামকৃষ্ণও কখনো তাঁর পানেব বটুয়া ভুল কবেননি।'

নইলে সভাস্থল থেকে নগ্নপদে বেরুচ্ছেন সেটাব মধ্যে সংস্কৃতি বলে কিছু নেই। কিংবা ফেরবার গাড়ি নেই, পদব্রজে স্টেশনে এসে ট্রেন ধবছেন বা বাদুড়ঝোলা হয়ে শহবতলিব বাস, সেটাব মধ্যেও নেই কোনো শালীনতা।

বক্তৃতা শেষ কবেই উঠে পড়েছেন প্রধান অতিথি। ফাংশনেব এখনো অনেক বাকি, তা থাক, আবেক সভায় ঠিকেদাবি আছে।

'এই যে স্যাব, গাড়ি তৈবি।' কর্মীদেব একজন বললে বীরদর্পে।

গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন ক্ষীণ কণ্ঠের একটি অনুবোধ কানে এল। 'আপনি তো দক্ষিণে যাচ্ছেন, যদি আমাদের লিফ্‌ট্ দেন—

'কে আপনারা?'

এবার হয়তো একটি বিপরীত কণ্ঠেব ঘোষণা কানে এল: 'আমরা উদ্বোধনের ডুয়েটটা গেয়েছিলাম। ইনি ছাত্রী আমি শিক্ষক।'

'তা আপনারা—' গদ্‌গদ হয়ে তাকাবেন না সন্ত্রস্ত হয়ে তাকাবেন প্রধান অতিথি দ্বিধা করতে লাগলেন।

'দেখুন, আমরা যাকে বলে 'লেসর' আর্টিস্ট, চুনোপুটি, আমাদের এরা বাড়ি ফেরবার গাড়িও দেবে না। দেব-দিচ্ছি করে শেষ পর্যন্ত বসিয়ে রাখবে। আপনি যদি একটু জায়গা দেন—।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়—' তারপর গাড়ি চলতে শুরু করলে বললেন প্রধান অতিথি, 'কেন তবে রাজি হন ?'

'স্যার, একটা ফুটিং-এর জন্যে। যদি নামটা একটু চাউর হয়, যদি আরেকটা প্রোগ্রাম পাই। খবরের কাগজের সম্পাদক যেখানে সভাপতি কি·প্রধান অতিথি, সে সব সভায় শামিল হবার চেষ্টা করি, সে সব সভারই জাঁকালো পাবলিসিটি জানেন তো, চাই কি, ছবিও একটা বেরিয়ে যেতে পারে। স্বার্থ যে একেবারে নেই তা নয়।'

কিন্তু আপনি রাজি হন কেন ? কেউ জিগগেস করে না প্রধান অতিথিকে।

আমি নিঃস্বার্থ। খুদিরাম দেশের জন্যে, আমি সংস্কৃতির জন্যে।

'কেন মশাই, আমাব কী দায় পড়েছে ? আমি কেন ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে যাব ?' একজন ঘাগী বনেদি সভাপতি তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠেছে।

'সবাই যে আপনাকে চায়।'

'সভাপতি না শোভাপতি! শুধু একটা ডেকরেশন। তার উপাধি বিদ্যাভূষণ নয় ভাষণভূষণ। তবু তার কথা শোনবার জন্যে কারু যদি মাথাব্যথা থাকত! বলে, নৃত্য-নাট্যের দেরি করিয়ে দিচ্ছে, হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিন, মশাই। তবু নৈবেদ্যের চূড়ায় চিনির ডেলাটুকুর মতো সভাপতি একটি না জোটালেই নয়। কিন্তু তার মজুরি মুনাফা কিছু নেই। অন্য সব ডেকরেশনেরই দাম দিতে হয়, তার বেলায় কাঁচকলা। সকলের কপালে চন্দনের ফোঁটা, সভাপতির কপালে চুনের ফোঁটা। তার উপর শেষ পর্যন্ত বসে থাকো। গ্রাসে তো কিছু নেই, শ্বাসেও নিঃশেষ।'

কাঁচকলা—কাঁচকলাই সই। সেক্রেটারির বাড়ির ক্ষেতে নানা-জাতের শাকসবজি দেখছি। তাই দিন আঁটি বেঁধে। পুঁই, উচ্ছে, ডেঙ্গো, নটে,—তাই বা মন্দ কি। হ্যাঁ, চলবে, কাঁচকলাও চলবে।

মধুবাবু সভাপতি, বিধুবাবু প্রধান অতিথি এমনি ধারাই বিজ্ঞাপন। কর্মকর্তাদের কানে-কানে মধুবাবু কি বললেন, প্রস্তাবের সময় পাল্টাপাল্টি ঘটে গেল। মধুবাবু প্রধান অতিথি, বিধুবাবু সভাপতি হলেন। বিধুবাবু ভাবলেন, এতে তার কী এসে গেল! যা মুড়ি তাই চালভাজা।

তা নয়। সংসার এক সিঁড়ি, কেউ ওঠে কেউ নামে। আর প্রধান অতিথি পালায়।

প্রধান অতিথির ডাক আগে। বলাকওয়া শেষ করেই হাত-জোড়! আমার অন্যত্র একটু কাজ আছে, আমি আসি।

আর তুমি সভাপতি, তুমি বোকা, তুমি বসে থাকো।

সিঁড়ি, তুমি কার? যে যায় তার।

কত কিছু যে যাচ্ছে-হচ্ছে সব তুমি শোনো। সহ্য করো।

তাই, মাপ করুন, সভাপতি নয়, প্রধান অতিথি করে দিন।

সেবার, প্রধান অতিথি নেই, সভাপতিকেই সর্বাগ্রে ভাষণ দিতে আহ্বান করল। যাক, আগে অন্তত পালানো যাবে।

'আপনার বক্তৃতাকে একটু লম্বা করুন।' বক্তৃতার মধ্যেই গলা বাড়িয়ে কানে-কানে বললে সেক্রেটারি: 'আরো অন্তত আধ ঘণ্টা।'

উদ্যোক্তাদের আরেকজন ও-কানে বললে, 'চল্লিশ মিনিট।'

'কেন বলুন তো?'

'উদ্বোধন সংগীত যিনি করবেন সেই আর্টিস্ট এখনো এসে পৌছননি। আরেকটা সভায় আটকা পড়েছেন। সুতরাং—'

সুতরাং, যত খায় তত লালায়। দুদিকেই মার খাবার ভয়। মার খাবার ভয় বেশিক্ষণ কইলেও, বেশিক্ষণ না কইলেও।

'আহ্লাদের প্রহ্লাদ সেজে চলেছেন কোথায়?' সভাপতির গাড়িতে রাস্তার উপরেই হামলা, 'কোন পাড়ায়?'

'উত্তর ঘোষপাড়ায়!'

'আমরা দক্ষিণ ঘোষপাড়ার লোক। আমাদের কথা মনে নেই?'

'মনে করতে পারছি না।'

'মনে করে দেখুন। আমরা আপনার কাছে আগে গিয়েছিলাম। আমাদের নেমন্তন্ন আপনি নেননি—'

'হবে। খেয়াল নেই।'

'চলবে না এ খেয়ালিপনা।' দক্ষিণ ঘোষপাড়া আস্তিন গুটোতে লাগল। 'পরে কিনা আমাদের শত্রুপাড়ার নিমন্ত্রণ নিয়ে আমাদের মুখে চুনকালি মাখাতে এসেছেন! ওরা ডঙ্কা মেরে বলে বেড়াবে, তোরা আনতে পারলি না, আমরা পারলাম—এ সইতে বলেন আমাদের?'

'না, বলি না। এবার থেকে যে সভার নিমন্ত্রণ নিলাম যেমন নোট করি তেমনি যে সভার নিমন্ত্রণ নিলাম না সেটাও নোট করে রাখব।'

'তা রাখুন। এখন গাড়ি ফেরান।'

যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি। কিন্তু উত্তর ঘোষপাড়াও নিরুত্তর নয়। দক্ষিণে-উত্তরে শুরু হয়ে গেল হাতাহাতি। সভাপতি ছুটে পালালেন।

প্যাণ্ডালে আগুন লাগাতেও দেখেছি। আপনি যাবেন এ কথা রাষ্ট্র করে বারোয়ারি চাঁদা তুলেছে অথচ আপনি ঘুণাক্ষরেও জানেন না। শেষে সভায় লোকজন যখন জমায়েত হয়েছে, বলে দিলেই হল, আপনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কিংবা আপনিই ইচ্ছে করে আসেননি। সবাই কি আর ফাঁকা কথার বশীভূত? লঘ্বারম্ভে বহ্বক্রিয়া করে দিল।

টিকাটিপ্পনীও আছে। নিজেরা নিতে আসতে দেরি করলেন, দোষ হল সভাপতির। বললেন, হয়ই না—কোঁচায় চুনট দিচ্ছে না গোঁফে কলপ দিচ্ছে কে বলবে।

তবেই দেখা যাচ্ছে, কত ঝক্কি কত বিপদ। কাঁচা আনাজে চলবে না মশাই, দু হাঁড়ি সরভাজা দিয়ে দিন। আর কী পাওয়া যায় এ অঞ্চলে? সন্দেশ? মনোহরা?

সরভাজার এক হাঁড়ি বাড়ির জন্যে, আবেক হাঁড়ি ময়রার দোকানে।

গলায় মালা পরে কে ওই যাচ্ছে?

দূব, অত বুড়ো কি বর হয়? ও শুধু-পতি নয়, ও সভাপতি।

ওদের হাসতে দেখে সভাপতি ওদের কাছে এলেন। বললেন, 'এতে হাসবার কী হয়েছে? আর কী পাওনা আছে আমাদের? এই মালাই একমাত্র পুবস্কার। আদর করে দিয়েছে আদর কবে নিয়ে চলেছি। মালা কি হাতে করে বইবাব, না, পকেটে কবে? মালা বুকে করে বইবার। বুকে দোলে তার বিরহব্যথাব মালা—'

সভাপতি প্রধান অতিথির এক গাড়ি। এক সঙ্গে ফিরবে। সভাপতি তাড়া দিচ্ছেন, প্রধান অতিথির কা হল? এত দেরি কেন? কোথায় গেলেন? রাত হয়ে গেল যে।

'প্রধান অতিথি ভাত খাচ্ছেন।'

'একেবারে রাতের খাওয়া সেরে নিচ্ছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। অফিসে আজ রাত্রে ডিউটি পড়েছে। বাড়ি ফেরবার সময় নেই—'

জনান্তিকে জেনে নিলেন সভাপতি, পদ কি। পদ চতুষ্পদ। তাহলে টিফিন-কেরিয়র তো আনিনি, ঝোল কম করে ভাঁড়ে করেই শুকনো-শুকনো দিন খানিকটা মাংস।

এ সব, এত সব লক্ষ্য করবেন না, যেমন লক্ষ্য করবেন না কী উদ্দেশ্যে লেখক কাকে দিয়ে ভূমিকা লেখায়, কাকেই বা উৎসর্গ করে।

ত্র্ধর্ষ কাউকে দিয়ে ভূমিকা লেখানো বা প্রকাশককে বই উৎসর্গ করা সত্ত্বেও তো বই ভালো হয়। আসলে যেখানে ভালো যেখানে আলো সেখানেই দর্পণ ফেল। ভালোতেই মূল্যায়ন, ব্যতিক্রমে নয়।

নইলে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে তো মাটির কলসী আর রজনীগন্ধার ডাঁটই বিক্রি হয় না, বইও বিক্রি হয়। রবীন্দ্রমেলায় যদি রবীন্দ্রফুলুরি বা রবীন্দ্রপাঁপর বিক্রি হয় তো হোক না। বিদেশীদের রবীন্দ্রসভায় যদি লেমনেডের বোতল ভাঙার শব্দ ওঠে ঘনঘন, শোনা যায় করতালির হুল্লোড়, মার্জনা.কোরো। সঙ্কেতে পরিহাসে স্তোভে অনর্থক বাক্যে নৃত্যগীতে নামের কথন-কীর্তন তো হচ্ছে। অভ্যাসেই অনুরাগ। চাঁটি মারতে-মারতেই বোল।

অলিতে-গলিতে ছাদে-ফুটপাতে কত সভা, কত বৈঠক। সব বৈঠকেরই বৈষ্ণবের মতো শব্দপ্রত্যয় নয়। কত চিত্তস্পন্দী আবৃত্তি কত হৃৎকর্ণরসায়ন গান কত উদ্দীপ্তমধুর বক্তৃতা। কত বেশি লোক গান গাইতে পারছে এবং কত ভালো গান, কত বেশি লোক বক্তৃতা দিতে পারছে এবং কত ভালো বক্তৃতা। শুধু গানের জন্যেই নয়, বক্তৃতার জন্যেও জনতা সভাবেষ্টনী থেকে উছলে পড়ে রাস্তায় প্রবাহিত হচ্ছে। কত সভা কেমন পরিমিত পরিচ্ছন্ন। রুচিররুচি-সমৃদ্ধ কত সভা পবিত্রতায় তীর্থীকৃত।

নিত্যনবীন লেখক দিক-দিগন্তর থেকে এগিয়ে আসছে, বহুবিচিত্র পসরা নিয়ে। বাঙলা সাহিত্যের ভূগোল ও ইতিহাসের ব্যাসপরিধি বেড়ে যাচ্ছে দিনে-দিনে। আরো কত পথিক এসে ঘা মারছে দুয়ারে।

অন্তত সম্পাদকের দুয়ারে।

হয়তো সম্পাদককে শিঙাড়া-অমলেট খাওয়াতে হচ্ছে, তা হোক ; বারে নিয়ে যেতে হচ্ছে, তা হোক ; তার এজেন্সিতে লাইফ-ইন্‌সিয়োরের পলিসি নিতে হচ্ছে ; তা হোক। ও সব কে লক্ষ্য করে, দেখ বহু কাঠখড় পোড়াবার পর কী অন্ন সে তৈরি করল ! অগ্নিবলেই অন্নবল। আগে উল্লা-তুল্লা ক্রমশই উদ্দিন।

কেউ গিয়েছে মুলিয়াদের সঙ্গে ঘর করতে, কেউ জাহাজীদের সঙ্গে, কেউ বা নাগা খাসিয়াদের দেশে, কেউ বা ক্যাম্পে রিফিউজি হয়ে। উদ্দেশ্য ? প্রাণধারণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে গল্প-উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করা। তেতলার চিলেকোঠায় বসে দেশোত্তর সাহিত্যের শূন্যগর্ভ স্বপ্ন দেখতে কেউ আর রাজি নয়।

'কি করে আধুনিক কবিতা লিখতে হয় বলতে পারেন ?'

'পারি।'

'কি করে ?'

'খানিকটা গদ্য লিখে দুপাশ পুঁছে ফেলে।'

আরেকজন বললে, 'আরো একটা উপায় আছে। ছোট ডোবায় খুব ভারি একটা ইষ্টকখণ্ড সজোরে নিক্ষেপ করে। সবলে ভারি পদার্থ ছুঁড়ে মারলেই জল ঘোলা হবে আর ভাবানো যাবে ডোবায় না জানি কত জল। তেমনি কবিতাকে গভীর দেখাবার জন্যে কটা দুরর্থক শব্দ ছুঁড়ে মারো। বক্তব্য ঘোলা করলেই অর্থ অতলস্পর্শ দেখাবে।'

তবু একমাত্র আত্মলীন ও আত্মরতাতুব ছাড়া কে না দেখবে বাঙলাদেশের নবতন সৃষ্টি-সমারোহের চেহারা। কত লেখক-লেখিকা কত নতুন মনের আকাশ নিয়ে বেরিয়ে এসেছে, চোখে তাদের কত রঙিন ঔৎসুক্য, হীরকশুভ্র সন্ধিৎসা। সত্য করে জানার স্পষ্ট করে জানার সৎসাহস। তেতলার চিলেকোঠার ফোকর দিয়ে রাস্তা দেখায় তাদের তৃপ্তি নেই। রাস্তায় না নামলে মানুষ কোথায়, চলন্ত মানুষ, জ্বলন্ত মানুষ। আর মানুষ ছাড়া কিসের শিল্প কিসের সাহিত্য।

এই চরিষ্ণু মানুষের জগতে লেখকদের শিল্পীদের আজ কত বড় সমাজ। সেইই বিচ্ছিন্ন ও সমাজহীন যে-মানুষের মধ্যে নেই, বারান্দায় রেলিঙের ফাঁকে যে মিছিল দেখছে।

দীপান্বিতা দেখতে হলেও রাস্তায় বেরুতে হয়।

বলবেন, সমালোচনার চেহারাটাই বুঝি এমনি। যে নখে

কণ্ডূয়ন সে নখেই রক্তক্ষরণ। বিশেষরূপে যে দগ্ধ সেও তো বিদগ্ধ। তাই তার হাতে পড়ে আলোচনার আলোটুকু উড়ে যাবে তাতে আর সন্দেহ কি। নতুবা অন্যান্য সূক্ষ্ম উপায়ে তার স্তবগুঞ্জন করুন, চাটুর চাট মিশিয়ে আপ্যায়িত করুন তার কৃতিত্বের অভিমানকে, একটা কিছু সুফল ফলবে, হয় ভূমিকা নয় অভিমত। যেমন রেজেষ্ট্রি অফিসে দলিললেখকদের মুসাবিদা ঠিক করা থাকে এও প্রায় তেমনি। অনেকে আবার নিজে থেকে যেচে বাড়ি বয়ে এসে ভূমিকা লিখে দেয়। মানে লেখকের সঙ্গে সঙ্গে, আমি যে একজন অধিকারী, সেটাও এ সুযোগে প্রতিষ্ঠিত হোক।

'কী বই-ই লিখেছেন স্যার।' খাসকামরায় উকিল এসে বললে গদ্‌গদ হয়ে।

আপনি তখনই সাবধান হয়ে যান। বলেন, 'একটা পিটিশন আছে বুঝি?'

ঠিক বুঝেছেন। উকিল তখন আমতা-আমতা করে বলছে, 'না স্যার, সে কি কথা স্যার, আপনার বই স্যার—'

তেমনি পাকে-প্রকারে সমালোচক লেখককে জানায়, কী লেখাই তোমার বেরুচ্ছে বন্ধু—

একটা ভূমিকা লিখে দেবেন? আর বই যদি বেরিয়ে গিয়ে থাকে, একটা সার্টিফিকেট?

লেখক ভাবছে তার নিজের কথা, সমালোচকও ভাবছে তার নিজের কথা। যে যার নিজের মতলব হাসিলে মশগুল। লেখকের চেয়েও সমালোচক চতুর। লেখক সন্দেহও করতে পারছে না পরের ধনে পোদ্দারি করতে গিয়ে কোন ব্যাঙ্কে কী ক্যাশ করে নিচ্ছে সমালোচক। হয়তো কারু উপর কোনো পুরোনো ক্রোধের শোধ নিচ্ছে, প্রসন্ন নয়ন হঠাৎ বক্র করে কারু প্রতি হানছে কঠিন কটাক্ষ।

'আর আমরা?'

'আপনাদের তো সিনেমার কাগজ, ব্যায়ামের কাগজ—'

'একপাশে সাহিত্যও আছে। এই দেখুন জাঁদরেলরা সবাই লিখছেন। আপনিও দিন না একটা গল্প।'

'তিনি মেলাবেন—মেলাবেন—' কোন একটা সুন্দর কবিতা সেদিন পড়েছি। কিন্তু এমন মিলনের কথা ভাবতে পারেননি কবি। সিনেমার সঙ্গে ব্যায়াম, আবার ব্যায়ামের সঙ্গে সাহিত্য।'

'কী করব বলুন। কাঁটালের মাছি তো গোলাপের নির্যাসে আসবে না। তাই শিশিতে গোলাপের নির্যাস পুরে বাইরে চারদিকে কাঁটালের রস মাখিয়ে দিয়েছি। তারপর ছিপি খুলে যাবে—বুঝবে কাকে বলে গোলাপের সৌরভ। কাঁটালের কাছে ফুটলেই কি গোলাপের জাত যায়, না, তাব শিল্পীমনের অবনতি হয়?'